হলদে দুপুর

হলদে দুপুর

বিরাম মুখোপাধ্যায়

অগ্রগতি পাব্লিশিং ওয়ার্কস্
২০।১, মদন মিত্র লেন, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ

মাঘ—১৩৪৪

জানুয়ারী—১৯৩৮

এক টাকা

২০।১, মদন মিত্র লেনের অগ্রগতি প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
থেকে আশু চট্টোপাধ্যায়ের দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

আশু চট্টোপাধ্যায়

বন্ধুবরেষু—

মৃতা তটিনীর তীরে

এক আষাঢ়-সন্ধ্যায় কোলকাতার আকাশে ক্ষ্যাপা মহিষের মতো শিঙ্ উঁচু কোরে কয়েকটা কালো, পাত্‌লা মেঘ ছুটে বেড়াতে লাগলো। আকাশ থেকে গঙ্গার বুক পর্য্যন্ত বাতাস ভারি ও ঠাণ্ডা। রাস্তার ধূলো অস্থির হ'য়ে ঘুর্‌তে-ঘুর্‌তে জান্‌লার পর্দ্দা ঠেলে' ঘরের মধ্যে ঢুকলো, আর আমাদের বাগানের পুষ্পিত হেনার ডালে মৌমাছিরা আছ্‌ড়ে পড়লো সকরুণ গুঞ্জনে।

আকাশের দিকে দু' একবার ভুরু উঁচু কোরে সে-সন্ধ্যায় আর বেড়াতে বেরুলাম না। ছোটো বোন্ মন্দাকে আবার চায়ের হুকুম কোরে নিজের ঘরে গিয়ে ব'সলাম। প্রত্যহের সান্ধ্য-স্বভাব বার-বার তাগিদ দিচ্ছে, চলো, একটু বেড়িয়ে আসি; মন উদাসভাবে গুন্-গুন্ কোরছিলো,—থাক্ না, এই সন্ধ্যায় মস্তিষ্কের কোষে যদি একটা বিচ্ছেদের কবিতা নেমে আসে। মনের রসালো প্রস্তাবেই সায় দিলাম শেষপর্য্যন্ত।

ঘরে এসে রঙিন্ কাগজের প্যাড্ নিয়ে ব'সেছি, মুদিত নেত্রে দেবী-সরস্বতীর নয়ন-তারার দিকে তাকাতেই আমার পায়ের নখ থেকে কেশাগ্র অবধি সোনালী সাপের মতো একটি বিদ্যুৎ নেচে উঠলো। কুঁজোর জল শেষ না হ'তেই, মাথার চুল না ছিঁড়তেই মস্তিষ্কে কবিতা নেমে এল,—'মৃতা তটিনীর তীরে'।

'মৃতা তটিনীর তীর'-কে ছন্দের সঙ্গীতে, ভাবের ব্যঞ্জনায় ও

হলদে দুপুর

উপমার তীক্ষ্ণ নতুনত্বে সবে মাত্র স্মরণ কোরেছি, এমন সময় সদর দরজার কড়া বেজে উঠলো। প্রথমে সাড়া না দিয়েই চুপ কোরে ছিলাম, শেষ অবধি চাকরটি অভ্যাগতের সুমুখে গিয়ে আমার হ'য়ে শিষ্টতা রক্ষা কোরলো।

আসন্ন ঝড়ের মতো গম্ভীর গতিতে রমাপতি আমার ঘরে ঢুকে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে মুখোমুখি হ'য়ে ব'সলো। আমি তাড়াতাড়ি প্যাডখানি ড্রয়ারের মধ্যে ঢুকিয়ে রেখে তার চোখের দিকে তাকিয়ে বোললাম: এস রমাপতি।

রমাপতি চেয়ারে এঁটে বসে' বোললে: কি কচ্ছিলে?

—এমন কিছু না,—এই একটা—

—কবিতা লিখছিলে!—বেশ আছো কিন্তু!

রমাপতির মুখে কবিতার কথা উচ্চারিত হ'তেই নিজের মধ্যে করুণ হ'য়ে উঠলাম; বন্ধ-করা ড্রয়ারের দিকে তাকাতেই আমার সমস্ত কবি-প্রবৃত্তি কেমন যেন সঙ্কুচিত হ'য়ে উঠলো। একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে তার দিকে চাইতেই সে আবার সহজভাবে বোললে: চায়ের কথা বলে' দাও পরিমল।

সেইখানে ব'সেই মন্দাকে হুকুম কোরলাম,—রমাপতির জন্য আর এক কাপ।

কী বোলবার জন্য রমাপতি যেন উস্‌খুস্ কোরছিলো। মনে হ'ল, আমার একটি প্রশ্নের অপেক্ষায় সে নিজের মধ্যে

হলদে দুপুর

ছট্ফট্ কোরছে। অন্যদিনের মতো আজ তার মাথার চুল সজারুর কাঁটার মতো দুর্বিনীত ঔদ্ধত্যে খাড়া হ'য়ে নেই। সদ্য ক্ষৌর-মসৃণতায় মুখে একটি দীপ্তির লাবণ্য নেমে এসেছে। অনেকদিন তার পরিচ্ছদে এম্‌নি শুভ্রতা ও নিপুণ পারিপাট্যের সঙ্গতি দেখা যায় নি। আপাদমস্তক লক্ষ্য কোরে আমি জিজ্ঞেস্ কোরলাম: বাসার অসুখ কেমন রমাপতি?

এই প্রশ্নের অপেক্ষায় সে যেন এতক্ষণ প্রস্তুত হ'য়ে ব'সে-ছিলো। চেয়ারটা আমার দিকে আর-একটু এগিয়ে এনে কৃত্রিম বিরক্তির স্বরে বোললে: আর বোলো না। এই ত তা'কে পিণ্ডী গিলিয়ে, দুই মেয়েকে খাইয়ে, ঘর-দোর মুক্ত কোরে আস্‌ছি।

আমি একটু সহানুভূতি জানালুম: কী কোরবে বলো! সহ্য করা ছাড়া আর উপায় কী আছে!

—না, না, পুরুষ মানুষের হাড়ে আর এত সহ্য হয় না। দু'বেলা ডাক্তারখানা আর দোকান আর রান্নাঘর; এর উপর অফিস ত আছেই। আর পারিনে পরিমল!

—বাসায় রুগী রেখে' এই ঝড় মাথায় নিয়ে আবার বেরুলে কেন?

—ইচ্ছে কোরে কি বেরুই? ঘর আমাকে দু'দণ্ড চায় না। অফিস থেকে এসে তার পথ্য রাঁধলুম, পরণের ছাড়া-কাপড় কাচলুম। তবু কি আমার রেহাই আছে!

হলদে দুপুর

—কেন, আবার কি হ'ল ?

—সর্ব্বক্ষণ যা হচ্ছে তাই। বিছানায় শুয়ে-শুয়ে দিন রাত আমার চোদ্দ-পুরুষকে স্বগ্গের সিঁড়ি দেখাচ্ছে হেনা। জ্যান্তো থাইসিসের রুগী, বলে কিনা, দোকানের রান্না-মাংস এনে দাও; বলে কিনা, রাত্রে আমি মাখম দিয়ে ভাত খাবো—ডাক্তার বলে' গেছে। জবাব না দিয়ে চুপ কোরে থাকলে দাঁতে দাঁত রেখে খিচুতে থাকে, কখনো বা তেড়ে মারতে আসে। আর সহ্য হয় না পরিমল! এই আবার চ'লেছি ডাক্তারের কাছে।

মন্দা চা রেখে গেল। চায়ের কাপ তুলে নিয়ে রমাপতি সোজা হ'য়ে ব'সলো। আস্তে দু' একটি চুমুক্ দিয়ে বোললে আবার: ঘরের চায়ের আস্বাদ এক রকম ভুলেই গেছি।

আমি তার আক্ষেপের উক্তিকে টেনে' আর দীর্ঘ কোরলাম না। কিছুক্ষণ চায়ের কাপে মুখ নামিয়ে দু'জনেই চুপ কোরে-ছিলাম। একটু পরেই আবার মুখোমুখি হ'লাম। বোললাম: কিছুদিনের জন্যে তোমার বিধবা শালীকে আনো না এখানে!

কপালের চামড়ায় ঢেউ তুলে সে বোললে: যা বোলেছ! গোদের উপর বিষফোড়া। এই দু'টো পেটে দু'মুঠো ভাত আর কোমরে কাপড় জোটে না,—এই সংসারে আবার শালী! বোললে বিশ্বাস কোরবে না তুমি, পয়সার অভাবে কাল ঘুমন্ত মেয়েটার হাত থেকে চুড়ি দু'গাছা নিয়ে বিক্রী কোরে এলাম। তবে পথ্য হ'ল, ওষুধ এল।

হলদে দুপুর

রমাপতি একটু থামলো। এক মুহূর্ত্তে তার মুখের রঙ্ গেল বদ্‌লে—দারিদ্র্যের করাল দুঃস্বপ্ন থেকে এইমাত্র সে যেন জেগে উঠেছে: আর তাই নিয়ে এতক্ষণ তুমুল ঝগ্‌ড়া হেনার সাথে। লিলির চুলের মুঠি ধরে' গালে দু'টি চড় লাগিয়ে আমি উন্মত্তের মতো চেঁচিয়ে উঠলাম, পাজী মেয়ে, একা গলিতে না গেলে যমের বাড়ীর পথ খুঁজে পাও না! লিলি কাঁদতে লাগলো; তার উপর হেনা বিছানা থেকে ধুঁক্‌তে-ধুঁক্‌তে নেমে এসে তার গালে আরো দু'টি চড় বসিয়ে দিয়ে মেয়েকে ঘর থেকে গলা-ধাক্কা দিলো; আর আমার দিকে তাকিয়ে গর্জ্জন কোরে উঠলো,—জ্যান্তো মেয়ের হাত থেকে দিনের আলোয় চোরে চুড়ি ছিনিয়ে নিয়ে গেল, কাল বোলবে, অফিসের মাইনে পকেট কেটে নিয়েছে—কা'কে এ-সব বুঝোতে এসেছ তুমি? ছি, ছি,—দড়ি না জোটে, গলায় দা দাও!—বুঝ্‌লে পরিমল, সবই আমার অদৃষ্ট! হেনা বোঝে না এত বড়ো রোগের পথ্য ও ওষুধে কি পরিমাণ খরচ হচ্ছে। সপ্তাহে তিনদিন মাংসের জুস্, রোজ রাত্রে লুচি, বাথ্-গেটের বিল ও তার উপর ডাক্তারের ফী—আমার মতো কেরাণীর পকেট কী সামাল্ দিতে পারে?

চায়ের কাপে সশব্দে শেষ চুমুক্ দিয়ে সে লুব্ধনেত্রে আমার সিগ্রেট্ কেসের দিকে তাকিয়ে ইসারা কোরলে: বা'র করো একটা।

হলদে দুপুর

দু'টো সিগ্রেট্ বা'র কোরে একটি রমাপতিকে দিলাম, একটি ধরালুম নিজে। অনেকক্ষণ সে তার পারিবারিক অশান্তির ইতিহাস ও বিড়ম্বিত জীবনের করুণ কাহিনী বর্ণনা কোরে এল। স্বধু তার পাংশু মুখের দিকে চেয়ে এ-সব হজম করা আমাকে আর ভালো দেখায় না। সুতরাং, আমি তার বক্তব্যে একটু ছেদ দিয়ে জিজ্ঞেস্ কোরলাম: জ্বর আছে হেনার?

—জ্বর ত শাড়ীর মতো সর্ব্বক্ষণই গায়ে লেপ্টে আছে। শেষ-রাতের দিকে নতুন কোরে জ্বর আসে আবার। মেঝের উপর মাদুর বিছিয়ে মেয়ে দু'টোকে নিয়ে আমি পড়ে' থাকি, তা' তার সহ্য হয় না। জ্বর আসার সময় নরম হ'য়ে আমাকে জোর কোরে তার পাশে শোয়াবে। আর যখন জ্বরের যাতনায় ছট্ফট্ কোরবে, বিনা কারণে দাঁত খিচুবে আমাকেই! রোজ সকালে গরমজলে গা' মুছিয়ে দিই,—কিন্তু সাধ্য কী যে তার পাশে শুয়ে একরাত কাটাই। গায়ের গন্ধে ভূত পালিয়ে যায়!

রমাপতিকে আমি একটু সান্ত্বনা দিতে গেলুম: কী কোরবে বলো, অনেকদিন থেকে বিছানায় শুয়ে আছে—

সে আমার কথায় কান দিলো না: তারপর শোনো,—আবার কাছে না শুলে, গা'য়ে হাত বুলিয়ে না দিলে তার সোহাগের কান্না উথ্লে ওঠে। ডুকরে কাঁদে। বলে, কেন তুমি আমাকে বিয়ে কোরেছিলে?—সত্যি, বিয়ে না কোরে বেশ আছো

হল্‌দে দুপুর

পরিমল।...একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে' সে পোড়া সিগ্রেটের শেষ অংশটা জান্‌লা গলিয়ে ছুড়ে ফেলে দিলো।

রমাপতি আমার অবিবাহিত জীবনে ইঙ্গিত করায় মনে-মনে আমি একটু নুয়ে পড়লুম ; কিন্তু পরমূহূর্ত্তে তার বিবর্ণ মুখের দিকে চাইতেই প্রতিবাদের সমস্ত উত্তেজনা নিভে গেল।

আকাশের ক্ষ্যাপা মহিষগুলো এতক্ষণে মহাগর্জ্জন সুরু কোরেছে। সূঁচের মুখের সূক্ষ্মধার ও ছুটন্ত তীরের দ্রুততা নিয়ে বড়ো-বড়ো বৃষ্টির ফোঁটা আছ্‌ড়ে পড়লো সার্শীর উপর। রাস্তার গ্যাসের আলো কেঁপে উঠলো একটুখানি।

বুদ্ধির বৃত্তের মধ্যে কোনো কথা খুঁজে না পেয়ে আমি এক অস্বাভাবিক নীরবতার আশ্রয় নিলাম। এবং লক্ষ্য কোরলাম, রমাপতি আরো কী বোলবার জন্য জিভের ডগা শানিয়ে নিচ্ছে।

বিশ্রী নীরবতা।

চুপ কোরে না থেকে আমিই আগে কথা বোললুম : হেনাকে কিছুদিনের জন্যে ওর বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দাও না রমাপতি।

বোমার পল্‌তেয় আমি যেন আগুন লাগিয়ে দিলাম। রমাপতি গলার স্বর সপ্তমে তুলে চেঁচিয়ে উঠলো : বাকী আছে ওই ব্যবস্থাটা! হায়, পরিমল, তুমি কী জানো না আমার শ্বশুর কী প্রকৃতির লোক! কবে মা-র শ্রাদ্ধে একশো টাকা চেয়ে নিয়েছিলাম, এতদিন পরে তার জন্যে আমার মাইনে য়্যাটাচ্‌

কোরতে চান। ছোঃ, হাসপাতালের মড়ার গাদায় নামিয়ে দিয়ে আসবো ওকে, তবু আর সেখানে পাঠাচ্ছিনে।

—তোমার ভাগ্য মন্দ রমাপতি, দুঃখ কোরে কী কোরবে বলো!

—আরো স্পর্দ্ধা শোনো, বাপ তো একদিনের জন্যেও মরো-মরো মেয়েকে দেখতে আসেন নি—আমি যখন বাড়িতে না থাকি তাঁর গুণধর বড়ো তনয়টিকে মাঝে-মাঝে মেয়ের কাছে পাঠান। আর তনয়টি তাঁর ইয়ার সুধাংশুকে সঙ্গে নিয়ে দুপুর বেলা বোনের কাছে বসে' ভিটির্‌-ভিটির্‌ কোরে যান।

—সুধাংশু? কায়েতটুলির সুধাংশু?

—হ্যাঁ, সেই স্কাউণ্ড্রেল,—ঢাকার গাড়োয়ান-বাচ্ছা! একবার তা'কে সাম্‌নে পেলে টুঁটি ছিঁড়ে দিতাম।

চোখের তারা পাকিয়ে রমাপতি কনুই অবধি পাঞ্জাবীর আস্তানা গুটোলো, যেন এখুনি বুল্‌ডগের মতো লাফিয়ে পড়ে' সুধাংশুর টুঁটি ছিঁড়ে নেয়। চোখের আগুন কমে' আসতে কান্নার দীনতা নিয়ে সে বোললে: আর পরিমল, শুনলাম, হেনা সেই গাড়োয়ান-বাচ্ছার কাছে দু'শো টাকার জন্যে হাত পেতেছে,—পুরীর সমুদ্রের হাওয়া না পেলে রাজরাণীর মরে' সুখ হবে না। দু'বেলা তার মুখে শোনো সেই সুধাংশু আর সুধাংশু। আমি হতভাগা বাপ-ঠাকুর্দ্দার পিণ্ডী না দিয়ে মাগের সেবায় যে জাহান্নমে গেলাম, তার জন্যে এক মুহূর্ত্তের তরেও আহা উহু নেই।

হল্‌দে দুপুর

—তবু তোমাকে কর্ত্তব্য কোরে যেতে হবে।

—ছাই কোরতে হবে। ওকে আর একটুও বিশ্বাস করিনে। বড়ো মেয়েটাকে পাশের বাড়ী পাঠিয়ে ঘরে তালা লাগিয়ে অফিসে যাই, বিকেলে এসে সে-তালা খুলি।

—বলো কী!

—হ্যাঁ, এই হচ্ছে ওর উপযুক্ত ওষুধ।

একটু সময় সে চুপ কোরলো, তারপর আবার আমার মুখের দিকে চেয়ে করুণ স্বরে বোললে: কী বোলবো পরিমল, এক-এক সময় ইচ্ছে হয়, ওষুধের সঙ্গে ওকে বিষ খাওয়াই, না-হয়, নিজে চলন্ত বাসের নিচে মাথা রাখি! সুধু ছুঁড়ি দু'টোই আমার ইহকাল পরকালের শত্রু হ'য়েছে।

জান্‌লার কাছে উঠে গিয়ে সে বাইরে হাত বাড়ালো। আমি মিহিস্বরে বোললাম: বসো একটু, এখনও সামান্য জল হচ্ছে।

সে এসে ব'সলো, এবং আকাশের দিকে একটু অনর্থক তাকাবার চেষ্টা কোরে বোললে: কাল আমার এক মামা আসবেন। ভাবছি, লিলিকে তাঁর সঙ্গে পাঠিয়ে দেবো। কিছুদিন থাক্ সেখানে। দু'টোকে আর আগ্‌লাতে পাচ্ছিনে।

রমাপতি চঞ্চল শিশুর মতো চেয়ারের স্ক্রুর ফাঁকে হাতের নখ ঢুকিয়ে দিয়ে কেবল উস্‌খুস্ কোরছে। যে-কথা বলার অপেক্ষায় সে জিভ্ শানিয়ে বসে' ছিলো, বুঝলাম, নানাকথায় এখনও সে-কথাটি উত্থাপন কোরতে পারে নি।

হলদে দুপুর

দুঃখের কাহিনী শুনতে-শুনতে রাত্রিও কম হ'ল না। আকাশের জমাট মেঘ এখন ছিন্ন-ছিন্ন হ'য়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। সার্শীর উপর বৃষ্টির ফোঁটার আঘাত ক্রমে নরম হ'য়ে এল। আমি আমার হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বোললাম: আর দেরী কোরো না রমাপতি—বাসায় অতো বড়ো রুগী!

—না, আর দেরী কোরবো না; যাই ডাক্তারের কাছে।

রমাপতি এইবার মাথা নিচু কোরে খুব আস্তে বিনীতভাবে বোললে: হ্যাঁ, হেনা তোমার কাছে পাঠিয়ে দিলো পরিমল। কিছুতেই আমি আসবো না, তবু জোর কোরে পাঠিয়ে দিলো। বোললে, আমার নাম কোরে পরিমলবাবুকে বলো গিয়ে, পাঁচটা টাকা ধার না দিলে কাল সকালে ওষুধ আর পথ্য অভাবে আমি মারা যাবো।

রমাপতির করুণ মুখের দিকে চেয়ে আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে পাশের ঘরে গেলাম। পাঁচটি টাকা এনে হাতে দিতেই তার মুখমণ্ডলে নিরুদ্বেগের কোমল প্রসন্নতা ফুটে উঠলো। টাকা পাঁচটি মুঠোর মধ্যে নিয়ে সে কৃতজ্ঞতার স্বরে উচ্চারণ কোরলো: খুব উপকার ক'র্লে বন্ধু! দু' তারিখেই দিয়ে দেবো এটা।

রমাপতি উঠে দাঁড়ালো। টেব্‌লের উপর থেকে সিগ্রেট্‌ কেস্‌টা নিয়ে একটা সিগ্রেট্‌ ধরিয়ে বোললে: সত্যিই, তুমি বেশ আছো পরিমল! বিয়েতে আর কবিতা নেই। কবিতা

তোমাদের মতো নিশ্চিন্ত মাথা থেকেই বেরোয়। যাক্—কাল বিকেলের দিকে দু' পা এগিয়ে যেয়ো না একবার! কতোদিন দেখেনি বলে' হেনা প্রায়ই তোমার নাম করে।

—চেষ্টা কোরবো।

—চেষ্টা কোরবো না, অবিশ্যি-অবিশ্যি যেয়ো একবার। আচ্ছা এখন আসি।

শেষবার আমার চোখোচোখি হ'য়ে রমাপতি রাস্তায় নেমে গেল।

রমাপতি চলে' গেল, আর আমি কিছুক্ষণ অভিভূত হ'য়ে রইলাম। কিছুক্ষণ নিজের কোনো কার্য্যকরী অস্তিত্বের উপর বিশ্বাস করার মতো একটুও শক্তি খুঁজে পেলাম না। তবুও, গা' ঝাড়া দিয়ে সোজা হ'য়ে ব'সলাম। ড্রয়ার থেকে প্যাডখানা টেনে বা'র কোরলাম ও অত্যন্ত বিষণ্ণভাবে তাকালাম 'মৃতা তটিনীর তীরে'র সেই কয়টি লাইনের উপর। এক মুহূর্ত্ত মনে হ'ল, আমার জীবনের তুচ্ছতা ও ব্যর্থতার অতিরিক্ত আর-কিছু হয়তো এ-কবিতায় দিতে পারবো না। অথচ, অনেক আশা নিয়ে ছিলাম, একটু-কিছু আনবো এ-কবিতায়; নীরস অক্ষরের আত্মায় উজ্জ্বল, শাশ্বত কোনো সঞ্জীবনী সঞ্চার কোরবো।

হলদে দুপুর

এ-কবিতা পড়ে' অন্তত একটি পাঠক-মন শ্রদ্ধায় ও খুসিতে কবির প্রতি অবনমিত হবে,—আশা ছিলো। কিন্তু রমাপতি এসে আমাকে হত্যা করে' গেল।

এখন আর আমার কিছুই দেবার নেই। অনেক জীর্ণ চিন্তা, অনেক মহিমান্বিত স্মৃতি ঘুরে বেড়াচ্ছে আমার চোখের সাম্‌নে। ফাঁকা, ফ্যাকাসে হ'য়ে আস্‌ছে চারদিক। বড়ো বেশি অসুখী মনে হ'চ্ছে নিজেকে—কারণ, একদিন আমি সুখী হয়েছিলাম।

আমি সুখী হয়েছিলাম যৌবনের অন্ধকারময় একটি কোণ্ থেকে। সত্যি বোলতে কী, সেই অন্ধকারময় কোণে একটি কিশোরীর চোখের আলো ঝল্‌মল্ কোরে উঠেছিলো। আর তা' আগুনে পরিণত হয়েছিলো। আর সে-আগুন দু'টি হৃদয়ের মূল পর্য্যন্ত স্পর্শ কোরেছিলো। তারপর সেই পর্য্যন্ত। অতি সাধারণ উপসংহার। যা' আপনার ও আমার ও প্রায় প্রত্যেক অপ্টিমিষ্টের জীবনে এসে থাকে। মোটের উপর, সে-আগুন নিভে গেছে,—কালো, পোড়া দাগ রেখে গেছে।

বি, এ, পরীক্ষা দেওয়ার পর আমি বুঝেছিলাম, 'মন' নামক একটি ভয়ানক নিরবয়ব পদার্থ লুকিয়ে আছে আমার মধ্যে। ডিনামাইটের মতো ভয়ানক। সেই মন সে-সময় আবিষ্কার কোরলো, নিঃসঙ্গতা নামক একটি চিত্ত-বিক্ষেপকারী স্বভাবের আবির্ভাব হ'য়েছে এবং তার চর্চ্চায় যথেষ্ট আমোদ ও আনন্দ আছে।

হল্‌দে দুপুর

এই নিঃসঙ্গতার ছেলে-মান্‌ষীতে সে-সময় আমি একটু সুখী হয়েছিলাম। সুখী ছাড়া আর কী বোলবো! সুখী হ'লাম অনেক কল্পনা কোরে, এবং তা' বন্ধুদের কাছে বিনিময় কোরে। তখন রমাপতি আমার কাছে ছিলো সাধারণ বন্ধুত্বের অতিসাধারণ প্রয়োজন হিসেবে। রমনায় থাকতে সে আমাকে চিনতো, মানে, দু'জনে দু'জনকেই চিনতাম বন্ধুভাবে, সহাধ্যায়ীভাবে।

কলেজের পত্রিকায় চাঞ্চল্যকর কবিতা লিখে, ছাত্র বৃন্দের স্বাস্থ্য ও আনন্দক্ষয়কারী য়ুনিভার্সিটির প্রায় সব ক'টি স্কলারসিপ লুফে নিয়ে ও অর্থবান পিতার পুত্রত্বের সৌভাগ্য অর্জ্জন কোরে সে-সময় সকলের চোখে আমি একটা-কিছু হ'য়েছিলাম। না চাইতেই অনেক ছোটো-বড়ো সুযোগ আমার পায়ের নিচে গড়াগড়ি যেতো। কিন্তু একটি সুযোগ বিশেষভাবেই আমার জীবনের স্পর্শের অভাবে দিন গুন্‌ছিলো। আর এই সুযোগ আমাকে টেনে এনেছিলো পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্‌টর অচ্যুত আইচের পরিবারে।

দিনের পর দিন চুম্বকের আকর্ষণের মতো সেখানে কে যেন আমাকে টানতো। এ-কথা সত্যি, পুলিশের লোক অচ্যুত আইচের কোনো মোহময় ক্ষমতা ছিলো না আমাকে আকর্ষণ কোরবার। ক্ষমতা যা'র ছিলো, তার নাম না-ই বা কোরলাম এখানে।

হলদে দুপুর

প্রতি সন্ধ্যায় তাদের বাসায় গিয়ে একখানি ইজিচেয়ারে অর্দ্ধ-নিমীলিত চোখে বসে' থাকতুম। সেই সময়ে মনের সহযোগিতায় ছাত্র-জীবনের ক্লান্ত, একটানা সুরের অবসান হ'ল।

সেই সময়ে, সেই নিঃসঙ্গতার চর্চ্চায় আমার কবিতায় রঙ্ ফুটলো। প্রতি সন্ধ্যায় পকেটে নতুন কবিতা থাকতো—একজনের অর্ডার মাফিক্। উত্তরকালে কবি-যশ-সৌরভে আমার চতুর্দ্দিকে অনেক রসিকজনের সমাগম হবে,—এমনি আশ্বাস-বাণী শুনতে পেতাম আইচ-কুমারীর প্রশংসামুখর মুখে। উত্তরকালে তার ভাগ্যে যদি এই কবি-বন্দনার সুযোগ না আসে, সেই হেতু প্রতি সন্ধ্যায় আমার কবিতা শুনে সে একটি গোলাপ উপহার দিতো।

এই একটি অনিবার্য্য ঘটনা আমাকে লক্ষ্য কোরে তাকিয়ে ছিলো। অনেক দিনের যাতায়াতে আমরাও দু'জনে দু'জনের মুখের দিকে তাকাতে সাহস পেলাম। খুব সতর্কতা ও সাবধানতা ছাড়া আমাদের জীবনে যেন আর কিছুই রইলো না।

অনেক আশঙ্কা ও অনেক যন্ত্রণা নিয়ে এক চরমতম মুহূর্ত্তের জন্য আমরা অপেক্ষা কোরেছিলাম। দু'জনার মনের নিত্য নীরব প্রার্থনা ছিলো, দিন আসুক! কিন্তু সব চেয়ে মজার কথা, আমরা পরস্পর কেউ কারো এই মনোভাবের বিন্দু-বিসর্গও জানতুম না।

হলুদে দুপুর

শেষে দিন এল।

একটি ভয়ঙ্কর দিন। যার যন্ত্রণাময় প্রভাব থেকে আত্মরক্ষা প্রায় অসাধ্য হ'য়ে উঠেছিলো। তারপর নিঃশব্দে আমি আইচ-পরিবার থেকে সরে' দাঁড়ালুম। তারপর নিঃশব্দে সেখানে প্রবেশ কোরলো আমারই এক শুভার্থী বন্ধু।

আজ সন্ধ্যায় রমাপতি এসে আমাকে হত্যা কোরে গেল।

হত্যা ছাড়া আর কী! আমি রণক্লান্ত সৈনিকের মতো টেব্‌লের উপর ভেঙে পড়লাম। হতাশ হ'য়ে ভাবলুম, প্রয়োজন কী? প্রয়োজন কী আর সেই পুরোনো পোড়া-দাগের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কোরে? তার চেয়ে আবার দেবী-সরস্বতীর উজ্জ্বল মুখের দিকে তাকাই করুণ মিনতি নিয়ে—যদি তাঁর পবিত্র স্নেহ ও আশীর্ব্বাদের স্পর্শে মস্তিষ্কের কোষে সেই মৃত সঙ্গীতকে খুঁজে পাই। আর প্রয়োজন কী অতীতের কান্নায়!

বিষণ্ণ দৃষ্টিতে, অনেক আশা নিয়ে আবার তাকালুম প্যাডের সেই সদ্য-আরব্ধ কবিতার কাঠামোর উপর। অনেক, অনেক প্রার্থনা রাখলুম বাগ্দেবীর পদপ্রান্তে, হায়, কলমের ডগায় আর এক লাইনও এল না।

ছিঁড়ে ফেললাম প্যাডের সে-পৃষ্ঠা। নতুন কোরে, নিপুণ কোরে আবার সেই তিন লাইন পরের স্লিপে লিখলাম কিন্তু নতুন

একটা লাইনও জুড়তে পারলুম না। শুক্‌নো টেব্‌লের উপর মাথা খুঁড়লাম, মন ক্লান্ত হ'য়ে পড়লো, তবু, তবু 'মৃতা তটিনীর তীরে' ফিরে যেতে পারলুম না।

একটা বিষাক্ত পদার্থের মতো প্যাড্ ও চেয়ারটাকে দূরে ঠেলে' দিয়ে ঘরের মধ্যে পায়চারী সুরু কোরলাম। একটা সিগ্রেট্ ধরালুম। জান্‌লার কাছে গিয়ে মুখ বাড়ালুম,—আকাশে এখনও মেঘ আছে।

এমন সময় মা ঘরে ঢুকলেন: পরিমল, খাবার নিয়ে বসে' আছে ঠাকুর।

—যাই মা।

আরো নিষ্ঠুর ক্লান্তিতে, খাওয়া ও শোয়ার এক ঘেয়েমিতে সে রাত্রি কাটলো।

পরদিন সকাল বেলা।

ইজিচেয়ারে গা' ডুবিয়ে চায়ের সঙ্গে খবর-কাগজের পৃথিবীর সংবাদ গিল্‌ছি, এমন সময় একটি অপরিচিত ছেলে সঙ্কুচিত হ'য়ে আমার সুমুখে এসে দাঁড়ালো। চোখ তুলতেই দেখি, রমাপতির বড়ো মেয়ে লিলি সেই ছেলেটির পিছন থেকে আমার কাছে এগিয়ে এল। তা'কে দেখেই কাগজ নামিয়ে জিজ্ঞেস্ কোরলাম: কি লিলি, রমাপতি পাঠিয়েছে-?

—না কাকাবাবু। মা জান্‌তে পাঠালো, কাল রাত্রে বাবা আপনার এখানে এসেছিলেন কি না! কাল রাত থেকে বাবা আর বাড়িতে যান নি।

এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় লিলির কচি মুখে ম্লান ছায়া নেমে এল। আমি উদ্বিগ্ন হ'য়ে তার কথার প্রতিধ্বনি কোরে বোললাম: কাল রাত থেকে বাড়ী যায় নি? সে ত কাল সন্ধ্যের কিছু পরেই এখান থেকে চলে' গেছে।

—না, বাড়ী যান নি। মা তাই আমাকে খুঁজতে পাঠালো।

—তোমার মা কেমন আছে লিলি?

তার মা কেমন আছে সে-জবাব সে ঠিক দিতে পারলো না। তবে, মলিন, ব্যথিত দৃষ্টিতে লিলি আমার চোখের দিকে তাকালো: কাল রাত্রে অন্ধকারে বাইরে বেরুতে গিয়ে মা মুখ থুব্‌ড়ে উঠোনে পড়ে' গিয়েছিলো। সকালবেলা মুখ দিয়ে দু'বার রক্ত উঠেছে।

হেনার অভিশপ্ত জীবনের সীমাহীন যন্ত্রণার কথা স্মরণ কোরে শিউরে উঠলাম। থাইসিসের রুগী মুখ থুব্‌ড়ে পড়ে' গেছে, আর মুখ দিয়ে দু'বার রক্ত উঠেছে! উঃ! ভয়ে আমার হৃদ্‌পিণ্ডের মধ্যে কেমন যেন শির্‌-শির্‌ কোরে উঠলো। লিলিকে আপাতত শান্ত করার মতো কোনও সান্ত্বনার ভাষা খুঁজে পেলাম না। মুখ নিচু কোরে নিতান্ত মূঢ়ের মতো মেঝের উপর চেয়ে রইলাম।

লিলি বোললে : আমি এখন যাই কাকাবাবু। আপনাকে একবার যেতে বোলেছে মা !

—আচ্ছা তুমি যাও, আমি যাবো।

সেই ছেলেটির সাথে লিলি চলে' গেল। আমি উদ্বিগ্ন হ'য়ে রমাপতির কথা ভাবতে লাগলুম। আমার অনেক দিনের পুরোনো বন্ধু রমাপতি। অনন্ত দুঃখের ও অশান্তির গ্লানিতে সে কী তবে সত্যিই বাসের নিচে মাথা রাখলো! সে কী তার সন্তান ও স্ত্রীকে ভুলে গেল! আমার মন সমস্ত জড়তা ও নিশ্চলতা থেকে যেন চেঁচিয়ে উঠলো,—না, না, সে এত নিষ্ঠুর নয়! আত্মীয়-আবেষ্টনীর সমস্ত প্রতিকূলতাকে অগ্রাহ্য কোরে সে, আমার বন্ধু রমাপতি কৌমার্য্যের বৃন্ত থেকে পরম আদরে হেনাকে তুলে নিয়েছিলো। সে এত নিষ্ঠুর নয়। কিন্তু, রমাপতি কোথায় গেল, —এই চিন্তায় আমি নিশ্চল হ'য়ে বসে' রইলাম সেখানে।

তারপর সাতদিন কেটে গেছে।

মন্দার ফর্মাস ছিলো, আজ সন্ধ্যায় তার সাথে ন্যু-মার্কেটে গিয়ে দু'টো ফুলদানী পছন্দ কোরতে হবে। সেজন্যে, বিকেল থেকে তৈরি হচ্ছিলাম।

সাম্‌নের ঘরের বড়ো আর্শীর কাছে দাঁড়িয়ে দাড়ীর উপর

হলুদে দুপুর

ক্ষুর টান্‌ছি, এমন সময় আর্শীতে রমাপতির দীর্ঘ ছায়া প্রতিফলিত হ'ল। ক্ষুর নামিয়ে পিছনে তাকিয়ে দেখি, রমাপতি অত্যন্ত বিমর্ষভাবে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ, এম্‌নি সময়, আজ সাতদিন পরে তা'কে আশা করি নি। সুতরাং, একটু আশ্চর্য্য হ'লাম। একটু চুপ কোরে থেকে জিজ্ঞেস্‌ কোরলাম: এই যে রমাপতি, অফিস-ফের্‌তা নাকি?

রমাপতি গম্ভীর গলায় উত্তর দিলো: হ্যাঁ।

দাড়ীর উপর আবার ক্ষুর নিবদ্ধ করায় আমার আলাপ একটু ভেঙে যেতে লাগলো: সেদিন সকালবেলা তোমার মেয়ে লিলি—লিলি তোমাকে খুঁজতে এসেছিলো। আমার এখান থেকে—সেদিন গিয়েছিলে কোথায়?

—কেন বলো! শুনো পরে সে-দুর্ভোগের কাহিনী।

—বাসার সব—মানে—হেনার অসুখ কেমন?

—হেনা আর বাঁচে না পরিমল!—সে প্রায় কান্নার সুর টেনে' আনলো: আর তা'কে বাঁচাতে পারলুম না! সকালে যে অবস্থা দেখে' বেরিয়েছি, তা'তে মনে হয় না যে আর—

ক্ষুর বন্ধ কোরে আমি তার দিকে তাকালাম: ডাক্তার কিছু বোলেছে নাকি?

—আর ডাক্তার! সুধু পয়সার অভাবে বাঁচাতে পারলুম না।

—ডাক্তার কি বোলেছে, বলো না?

বন্ধুকে ভুলে গেলাম, তার অগোচরে বেরিয়ে এলাম সেখান থেকে।

গলিতে নেমে শিথিল গতিতে বাড়ী ফিরে আসছি, মুখ-চেনা এক ভদ্রলোক ডাকলেন : শুনছেন ম'শায় ?

রমাপতির বাড়ী-ওয়ালা। আমাকে সাক্ষী রাখবার জন্যই যেন তিনি বোললেন : শুনেছেন ম'শায় কাণ্ডটা, সকালে আপনার ওই রমাপতিবাবুর সাথে তাঁর স্ত্রীর তুমুল ঝগ্‌ড়া হ'য়ে গেছে।

—ঝগ্‌ড়া ?

—হ্যাঁ, রীতিমতো ঝগ্‌ড়া। কে এক আত্মীয় চিকিৎসা খরচ বাবদ ওঁর স্ত্রীকে নাকি দু'শো টাকা দিয়েছিলেন। আর উনি, আপনার ওই রমাপতিবাবু স্ত্রীর অজ্ঞাতে সে-টাকা আত্মসাৎ করেন।...

আমি বোবা ও বোকার মতো তাঁর দিকে চেয়ে রইলাম।

—ছি, ছি,—আপনার বন্ধুর কথা আর লোক-সমাজে বোলবার নয়! কী কেলেঙ্কারীটাই না হ'ল আজ সকালে। ভদ্রলোক গোঁয়ার, দেয়ালে মাথা ঠুকে দেওয়ায় স্ত্রীটি মূর্চ্ছা গিয়েছিলো!—এখন কেমন দেখে এলেন ?

আমি কিছুই জানি না, বা ওদিকে যাই নি—এম্‌নি ধরণের কী একটা জবাব দিয়ে চলে' এলাম।

হলদে দুপুর

বাড়ী এসে টেব্‌লের উপর মাথা রাখলুম। ভদ্রলোকের কথায় আরো কেমন যেন হ'য়ে গেছি। রমাপতি দেয়ালে মুমূর্ষু হেনার মাথা ঠুকে দিয়েছে—এ-কথা ভাবতে পারলুম না পরিষ্কার কোরে, বিশ্বাস কোরতে পারলুম না। অথচ, একটা নিষ্ঠুর রহস্যের প্রেত আমার চিন্তাকে আশ্রয় কোরে রইলো। শেষ পর্য্যন্ত, মন আমাকেই সান্ত্বনা দিলো: দরকার কী ভেবে? এ-সবে তোমার দরকার কী?

কিন্তু ঘুরে-ফিরে সমস্ত চিন্তা সেই একই কেন্দ্রকে ছুঁয়ে যেতে লাগলো,—এ কী কখনো সম্ভব! আমি ত তাদের ভালো কোরেই চিনি। আর, কে না জানে, রমাপতির জীবনে একমাত্র লক্ষ্য ছিলো ওই হেনা, আর হেনার জীবনে রমাপতি। তা'রা দু'জন পরস্পরকে প্রতারণা কোরেছে, এ-কথা ভাবতেও—

মন আবার নিষেধ কোরলো: দরকার কী! এ-সবে তোমার দরকার কী!

আজ সন্ধ্যায় আকাশে আবার ছিন্ন-ছিন্ন কালো মেঘের ছুটোছুটি। বাতাস ভারি ও ঠাণ্ডা। আমাদের বাগানের হেনার কুঁড়িতে মৌমাছিরা মধু-র বদলে অসহায় কান্না রেখে যাচ্ছে।

আমি উঠে সোজা হ'য়ে ব'সলাম। ড্রয়ার থেকে বা'র

কোরলাম সেই প্যাডখানা। দু'একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস কঠিন, দীর্ঘ প্রতিজ্ঞায় পরিণত হ'ল : যত রাত্রিই হোক্, যে-কোনো উপায়ে 'মৃতা তটিনীর তীরে' কবিতাটিকে আজ শেষ কোরবই ! ও-সবে আমার দরকার কী !'

ম্যাপে অক্সফোর্ড নেই

নটিংহাম-এর উপর দিয়ে রুবি গুপ্তার আঙুল করুণ হ'য়ে নিচের দিকে নেমে আসছে ক্রমশ। আর তার সূঁচলো দৃষ্টি ভড়্‌কে গিয়ে ম্যাপের এদিকে-ওদিকে ছুটোছুটি কোরছে। রুবির আঙুল দেখলো, ওই ত নটিংহাম, এই ত নর্ফোক,—অক্সফোর্ড তাহ'লে কাছেই কোথাও লুকিয়ে আছে।

নিশ্চয়ই আছে। অক্সফোর্ড,—অক্সফোর্ড—ম্যাপ থেকে জয়ন্তদা'র অক্সফোর্ড খুঁজে বা'র কোরতে না পারলে লজ্জার আর সীমা থাকবে না। তার আঙুল কাঁপছে, চোখের সাম্‌নে আলোর সহস্র ফুৎকার দলবদ্ধ পোকার মতো গোল হ'য়ে উপরে-নিচে ঘুরছে, তার বুকের মধ্যে এক্স্‌প্রেস ট্রেনের উদ্দাম গতি। জিওগ্রাফীর পরীক্ষক মিস্ মরিয়টের দিকে সকরুণ একটু তাকিয়ে রুবি চোখ বুজ্‌লো,—চোখ বুজ্‌লে যদি মনে পড়ে অক্সফোর্ড ম্যাপের ঠিক কোন্‌খানে আছে।

একটু পরেই চোখ উন্মীলিত কোরে রুবি দেখলো, ক্লাসের প্রায় সমস্ত মেয়ে তার দিকে সকৌতুকে তাকাচ্ছে। সাম্‌নের বেঞ্চের মীরা দে মুখে আঁচল চেপে হাসছে।

ব্ল্যাকবোর্ডে-ঝুলোনো গ্রেট বৃটেনের ম্যাপখানা বাতাসে দুলে-দুলে রুবির গায়ে এসে লাগছে।

দ্বিতীয় সুযোগও নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে দেখে মিস্ মরিয়ট বোললে: You may go to your seat, Miss Gupta.

হলদে দুপুর

আঙুল দিয়ে চোখ দু'টো জোরে রগড়ে রুবি শেষবার তার সন্ধিৎসু ব্যগ্র দৃষ্টিকে ম্যাপের উপর ছড়িয়ে দিলো। মরিয়া হ'য়ে সে আঙুল চালনা কোরতে লাগলো, আর সেই আঙুলের নিচে দিয়ে আবার নেমে গেল নটিংহাম, নর্ফোক, গ্লস্‌টার। গ্লস্‌টার দেখেই আনন্দে তার চেতনায় রোমাঞ্চ হ'ল : গ্লস্‌টার, গ্লস্‌টার—গ্লস্‌টারের ঠিক পাশেই ত অক্সফোর্ড কাউন্টি! নিশ্চয়ই অক্সফোর্ড বেরুবে এবার। আশা ও আনন্দে তার আঙুলের ডগায় লাল্‌চে রঙ্‌ ছড়িয়ে প'ল, অস্বাভাবিক ক্ষিপ্রতা সঞ্চারিত হ'ল,—এইবার অক্সফোর্ড বেরুলো বলে'।

পাগলের মতো দৃষ্টি ফেলে-ফেলে সে ছুঁয়ে গেল লণ্ডন, ম্যাঞ্চেষ্টার, হ্যাম্প্‌সায়ার। উঃ, জয়ন্তদা' বিলেত যাবার আগে বার-বার কোরে যে অক্সফোর্ড দেখিয়ে দিয়ে গিয়েছিলো।

চুলের মূল থেকে গুঁড়ো-গুঁড়ো ঘাম চুঁইয়ে এসে পড়লো তার মুখে। বুকে-পিঠে ভিজে ব্লাউজ চট্‌-চট্‌ কোরছে। বুকের চুড়োয় হারের লকেটটি ফুটছে যেন। সব সাব্‌জেক্টে ফার্ষ্ট হ'য়ে এসে আজ ভূগোলের এই পরীক্ষায় অক্সফোর্ড নির্দ্দেশ কোরতে না পেরে রুবি গুপ্তা মনের মধ্যে মোচড় খেয়ে ভেঙে পড়লো—ম্যাপে অক্সফোর্ড নেই!

মিস্ মরিয়ট এবার বিরক্তির স্বর টেনে বোললে : Will you take your seat please?···

হলদে দুপুর

লজ্জায়, অপমানে রুবি মুখ নত কোরে নিজের সিটে এসে ব'সলো। সিটে এসে ব'সতেই মীরা মুখ ফিরিয়ে রসিকতা কোরলো : জয়ন্তদা'র অক্সফোর্ডের ডানা গজালো নাকি!

রুবি কোনো সাড়া না দিয়ে বেঞ্চের উপর মুখ গুঁজে বসে' রইলো। নিজেকে তার বড়োই অপমানিত ও অসহায় মনে হ'তে লাগলো। ছি, ছি,—শুধু সে ছাড়া হয়তো সব মেয়েই অক্সফোর্ড দেখিয়েছে।

এতদিন ক্লাসের সব মেয়েই ত জানতো রুবির কে-এক-জয়ন্তদা' অক্সফোর্ডে থাকে, ক'বছর বাদে রুবিও যাবে সেখানে। প্রতি সপ্তাহে অক্সফোর্ডের নতুন-নতুন কাঁচা-পাকা কতো খবর বাতাসে উড়ে আসে তার কাছে—আর তা' নিয়ে সে স্কুলের টিফিনের হাল্‌কা অবসরকে তাতিয়ে সরগরম কোরে রাখে। সব মেয়ে তার মুখের দিকে হাঁ কোরে সেই অক্সফোর্ড-কাহিনী গিল্‌তে থাকে। এমন কি, দু'-এক দুপুরে দু'-এক বাঙালী দিদিমণিও তার শ্রোতা হ'ত। ছবি-আঁকা পোষ্টকার্ডে জয়ন্তদা' তা'কে যে-সব চিঠি লিখতো সেগুলো সে চালিয়াতির সঙ্গে সকলের সাম্‌নে ছড়িয়ে দিতো ক্লাসের মেঝের উপর, আর তা' মাড়িয়ে যেতো তাচ্ছিল্য ভরে: আরে, অক্সফোর্ড,—ক'বছর বাদে সেখানে গিয়েই ত থাকবো! জয়ন্তদা' লিখেছে, সুবিধে হ'লে সেখানেই একখানা বাংলো হাঁকুরে

ব'সবে,—সত্যি ভাই, বাঙলা দেশে দিন-দিন যা ম্যালেরিয়া বাড়ছে···প্রায় প্রতি দুপুরেই রুবি গুপ্তার মুখে এই কথাগুলোই নিশ্রান্ত উত্তাপে টগ্‌বগ্ কোরে ফুটতে থাকে।

লজ্জায়, অপমানে বাকী সময়টুকু মুখ তুলতে পারলো না রুবি। বাড়িতে গিয়ে মাকেই বা কি কোরে বোলবে যে অক্সফোর্ড বা'র কোরতে পারেনি। আবার, হয়তো এই সামান্য একটা ভুলের জন্যেই ভূগোলে ফার্স্ট হ'তে পারবে না। নিজের উপর রাগ হ'তে লাগলো তার। নিজের উপর আর তার প্রাইভেট্ টিউটর স্থনীলের উপর। উঃ, এত অপমান তার মোটেই হ'ত না, স্থনীল যদি তা'কে অমন কোরে না বুঝোতো যে অক্সফোর্ড ম্যাপ-পয়েন্টিং-এ আসবেই না। সকালে সে জয়ন্তদা'র-দেওয়া য়্যাটলাস্ খুলে অক্সফোর্ড খুঁজতে ব'সে-ছিলোই ত—কিন্তু তা'তে স্থনীলের বাধা দেওয়ার উদ্দেশ্য কী!

বিকেল চারটেয় 'ইউ, এম্, জি, এচ্, এস্'-এর ছুটি হ'ল। আলিপুরের মেয়েদের জন্য স্কুল-বাসের মধ্যে ক্লাশ এইট্-এর মাত্র দু'টি মেয়ে। রুবি ও মীরা। ছুটন্ত বাসের এক কোণ্ থেকে এতক্ষণে মীরা রুবিকে উদ্দেশ কোরে ডাকলো : ওগো অক্সফোর্ড, শুনছো!

বাসের অন্য মেয়েরা বিস্ময়াপন্ন হ'য়ে মীরার মুখের দিকে চাইলো—অক্সফোর্ড আবার কারুর নাম হচ্ছে নাকি আজকাল!

হলদে দুপুর

রুবি কোনো জবাব না দিয়েই তার বই-এর গোছার উপর মুখ নামালো। বাস্ এই মোড়টি ঘুরলেই তাদের বাড়ী এসে যাবে।

সন্ধ্যের পর বাড়িতে একা একঘরে নির্জ্জনে থেকেও রুবির কেমন যেন লাগছিলো। অন্যদিন হ'লে এ-সময় সে হয়তো অর্গানের মিষ্টি স্বরের মধ্যে নিজেকে গভীরভাবে হারিয়ে ফেলতো। আজ আর অর্গান ভালো লাগছে না, রেডিও-র নরম গান হৃদ্‌পিণ্ড থেকে যেন কোনো বিস্মৃত বেদনা-পিণ্ডকে টেনে ছিঁড়ে বের কোরে আনছে। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে সে রেডিও-র চাবিটা বন্ধ কোরে দিলো। একটু বাদেই তার মা অনুপমা এ-ঘরে এসে তা'কে একটা খামের চিঠি দিয়ে বোললেন : দেখ্‌তো রুবি, জয়ন্তর চিঠি কি না!

রুবি তার মা-র হাত থেকে খামখানা নিয়ে একটা চেয়ারে গিয়ে চেপে ব'সলো। খাম ছিঁড়তেই তার অস্তিত্বে উদ্দীপনা এল,—হ্যাঁ, এ ত জয়ন্তদা'রই চিঠি।—চিঠির এ-পিঠ ও-পিঠ উল্টোবার পর তার মুখ ফ্যাকাসে হ'য়ে গেল। এ ত তার দাদার আর মা-র চিঠি! তা'কে ত জয়ন্ত এক টুক্‌রোও লেখেনি এবার। মা-র চিঠি মা-কে বুঝিয়ে দিয়ে এসে কান্না চেপে

একবার গিয়ে দাঁড়ালো দোতলার বারান্দায়, একবার ছাদের কোণে। জয়ন্ত তা'কে এক টুক্‌রোও লেখে নি—রুবি বিশ্বাস কোরতে পারছে না। তারাহীন আকাশের দিকে তাকিয়ে সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে। ঘুরে দাঁড়াতে গিয়ে টবের গোলাপের লতা তার শাড়ীতে আট্‌কে গেল—শাড়ী ছাড়িয়ে নিয়ে সেই গোলাপের টবের দিকে চেয়ে রইলো কিছুক্ষণ।

এই সেই গোলাপের টব, বিলেত চলে' যাওয়ার আগের দিন রাত্রে জয়ন্ত এটাকে এখানে বসিয়ে রেখে গেছে। ছাদের এই সেই কোণ্ যেখানে দাঁড়িয়ে জয়ন্ত তা'কে বুকের মধ্যে লেপ্‌টে নিয়ে দিব্যি কোরেছিলো: দূরে থেকেও আমি তোমায় ভুলবো না রুবি। ভুলবো না—ভুলবো না। সাত সমুদ্দুর পার থেকে আমার চুমু এই গোলাপগাছে রোজ ফুটবে—তুমি তা' তুলে নিয়ো রুবি!… রুবি আজ বিশ্বাস করে কী কোরে, সেই জয়ন্তদা' গত তিনমাস তা'কে চিঠি দেয় না।

ছাদের এ-কোণ্ থেকে ও-কোণে গিয়ে দাঁড়ালো। মনকে মাঝে-মাঝে সান্ত্বনা দিচ্ছে, কী হবে পরের কথা ভেবে! কিন্তু মন ঘুরে-ফিরে সেই পরের কথা ভেবেই অবচেতনায় সুখ পাচ্ছে। আঙুলে আঁচল জড়াতে-জড়াতে রুবি তার দৃষ্টিকে সীমাহীন অন্ধকারের প্রান্তরে ছেড়ে দেয়। ক্লান্ত চোখের পাতা যখন জড়িয়ে আসে, সে উদাসভাবে উপলব্ধি করে,—জয়ন্তদা' কী কোরে এত নিষ্ঠুর হ'লো!

হলদে ছুপুর

এক-একবার মিনিট কয়েকের জন্য সে কঠিন হওয়ার ভাণ করে,—কী হবে পরের কথা ভেবে! ভাড়াটে, ভারী ত আত্মীয়! পাঁচ বছরের আলাপ, না-হয় তা' আজ আর নেই! জয়ন্ত তা'কে ভুলে গেছে—চিঠি দেয় না, কী হয়েছে তা'তে! নিচের ঠোঁট কাম্‌ড়ে সে নিজের মধ্যে এক মুহূর্ত্তের জন্য শক্ত হ'ল। কিন্তু সেই পাঁচ বছরের রাশি-রাশি ঘটনা যখন মনের সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসে, তখন তার কঠিন-হওয়ার সমস্ত শক্তি চোখের জলে ধুয়ে-মুছে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যায়।

জয়ন্তরা পাঁচ বছর তাদের নিচেরতলায় ভাড়াটে ছিলো। জয়ন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে এম, এ, পাশ কোরে অক্সফোর্ডে পি, এচ্‌, ডি, ডিগ্রী আনতে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই তার বাপ-মা বাসা ছেড়ে দিয়ে দেশে ফিরে গেছেন। সেই পাঁচ বছরের গাঢ় ঘনিষ্ঠতাকে রুবি এত সহজে ছিনিয়ে সরিয়ে দিতে পারছে না। কী কোরেই বা পারবে? জয়ন্ত তা'কে স্নেহ-মমতায় নিজের বোনের চাইতেও নিকট কোরে রেখেছিলো যে! জয়ন্ত না হ'লে একদিনও তার জিয়োমেট্রির পড়া হ'ত না,—একদিনও সে থিয়েটার-বায়স্কোপ দেখতে যেত না!

আর, বিলেত যাওয়ার ছ'মাস আগে জয়ন্ত তা'কে ভালোবেসেছিলো। ভালোবাসার তীব্র তাপে যখন তা'রা পরস্পরের কাছে কুসুমিত হ'য়ে উঠলো তখনি ঠিক হ'লো জয়ন্ত

অক্সফোর্ডে যাবে। রুবি তা'কে ধরে' রাখবার জন্য অনেক আব্‌দার কোরেছিলো, কেঁদেছিলো অনেক দিন ধরে'— কিন্তু কোনো ফল হয় নি।

আট মাস আগে সে নিজেই জয়ন্তকে গলায় মালা পরিয়ে দিয়ে বম্বে-মেলে সী-অফ্‌ কোরে এসেছে। .জোর কোরে সেদিন সে অভিভাবকদের সুমুখে তার অশ্রু-সজল চোখে ফিকে হাসির মুখোস পরে' ছিলো। আজ আবার ছাদের এই কোণে দাঁড়িয়ে পরিচয়ের সুরু থেকে জয়ন্তকে মনে পড়ছে তার! আজ কণ্ঠাগত কান্নায় কাঠিন্যের মুখোস্ গুঁড়ো হ'য়ে যাচ্ছে।

বিলেতে পৌঁছে অবধি বরাবরই জয়ন্ত তা'কে চিঠি দিয়ে এসেছে। মাস চারেক আগেও রুবি তার চিঠি পেয়েছে। কিন্তু তারপর ত কতোদিন হ'য়ে গেল,—উঃ, কতোদিন!

রুবি নিচেয় তাদের শোবার ঘরে নেমে এল। স্যুট্‌কেস্ নামিয়ে এক-এক কোরে জয়ন্তর সব ক'খানা চিঠি বা'র কোরলো। তারপর শেষ চিঠিখানি খুলে সযত্নে সে মনে-মনে পড়তে লাগলো:

রুবি, তুমি বোধ'য় আমার উপর রাগ কোরে গোলাপ লতার গোড়ায় আর জল দিচ্ছ না,—না, বেশি রাগ কোরে অসহায়াকে মুড়িয়ে কেটেছো একেবারে?···কী সুন্দর স্কটল্যাণ্ডের গ্রামগুলো, রুবি! তুমি যদি আমার পাশে থাকতে কী চমৎকারই না হ'ত!··· শনিবার এলে আমার আর নিস্তার নেই। বাড়ী-ওয়ালার মেয়ে

হলদে দুপুর

জনি সকাল থেকেই আমার পিছু-পিছু ঘুরবে। তা'কে নিয়ে চলো সিনেমায়, না-হয় সার্কাসে। স্কটল্যাণ্ডের গাঁয়ে গিয়ে জলার ধারে বসে' লাল-মাছ ধরা দেখাতেও তার কী ভীষণ উৎসাহ! এবার রোববারেও ওই গাঁয়ে কাটিয়ে এলাম জনি-র আব্দারে।··· জনি-র আব্দার শুনে তুমি মুখ ভার কোরছো কেন রুবি? রুবি, তুমি ওকে ক্ষমা কোরো। আমি ওকে মমতা না কোরে যে থাকতে পারি নে। সকালে গরম চায়ের কাপ নিয়ে এসে ও আমার দরজা ঠেলে। দুপুরে তাগাদা দিয়ে কলেজে পাঠায়। শুনলে হয়তো তোমার হিংসে হবে, সন্ধ্যের পর বাড়ী ফিরলে ও আমার গায়ের কোট্ খুলে নিয়ে গম্ভীর চালে কৈফিয়ৎ চায়, ফিরতে এত দেরী কেন! আজকাল ও আবার আমাকে ল্যাটিন্ শিখোবার জন্য ওর ছাত্র কোরেছে—আমি ওর ধার শোধ করি 'মৌচাকে'র গল্প শুনিয়ে। জনিকে নিয়ে এত লিখলাম বলে' রাগ কোরছো রুবি? রাগ কোরো না, লক্ষ্মীটি! তোমার জন্য আমার জমানো চুমুর-সিন্দুকে তালা লাগানো—কেউ তা' থেকে একটাও চুরি কোরতে পারবে না।······

দু'বার কোরে রুবি এই চিঠিখানি পড়লো। আর একখানা চিঠিতে হাত দিতেই তার ছোটো ভাই বিলু এসে ডাকলো: দিদিভাই, মাষ্টার ম'শায় তোমাকে ডাকছেন।

রাত্রে তাদের প্রাইভেট্ টিউটর সুনীল পড়াতে এসেছে।

হলদে দুপুর

মাষ্টার ম'শায় ডাকছেন শুনে রুবি শঙ্কিত হ'য়ে উঠলো একটু। চিঠিগুলো গুছোতে-গুছোতে সে বিলুকে বোললে: আচ্ছা তুমি যাও, আমি যাচ্ছি।

রুবি সুইং-ডোর ঠেলে' পড়ার ঘরে এসে ঢুকলো। নিজের চেয়ারে বসে' রুটিন্ দেখে সুনীলকে বোললে: আজ ত পরীক্ষা শেষ হ'য়ে গেল—কালও কোনো পড়া নেই। আমাকে আজ ছুটি দিন না মাষ্টার মশাই!

সুনীল তার চেয়ারখানা রুবির মুখোমুখি এগিয়ে এনে বোললে: পরীক্ষা শেষ হ'য়ে গেল? জিওগ্রাফী কেমন কোরলে?

জিওগ্রাফী কেমন কোরলে—এই প্রশ্ন শুনেই তার চাপা-পড়া অপমানের আগুন আবার ধুঁইয়ে উঠলো। জবাব দিতে গিয়ে বিনয়ের বদলে তার গলায় এল ঝাঁঝ: আমার মাথা আর আপনার মুণ্ডু কোরেছি।

সুনীল অবাক্ হ'য়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলো। কোনোদিন সে রুবির মুখ থেকে এম্‌নি অশোভন কথা ত শোনেনি। সুনীল ঘাব্‌ড়ে গিয়ে আবার প্রশ্ন কোরলো: কেন, কি হয়েছে!

—যা হবার তাই হয়েছে—রুবি গুম্‌রোতে লাগলো: কেন সকালে আপনি আমাকে অক্সফোর্ড দেখতে দিলেন না?

হল্‌দে দুপুর

—তোমার ও-ম্যাপে ত অক্সফোর্ড নেই !

—নেই, আপনি দেখেছেন—রুবি সুনীলকে যেন ধমক্ দিলো—অক্সফোর্ড দেখতে গিয়ে পাছে জয়ন্তদা'র কথা তুলি সেই জন্যেই আপনি দেখতে দেন্ নি। আমি কিছু বুঝিনা, না ?

—তুমি জানো না, ও-ম্যাপে অক্সফোর্ড নেই।···কিন্তু তুমি রাগছো কেন ?—রুবির হাত ধরে' মোলায়েম ভাষায় সুনীল তা'কে শান্ত কোরবার চেষ্টা কোরলো।

বিলু এতক্ষণ চুপ কোরে পাশের চেয়ারে বসে' কি যেন লিখছিলো। দিদিকে চটে' যেতে দেখে' তাড়াতাড়ি সে তার মা-র কাছে ছুটে গেল উপরে !

হাত ধরতেই রুবি আরো রুখে উঠলো। সুনীল তার হাত ছেড়ে দিয়ে ঘুরে এসে তার পাশে দাঁড়িয়ে বোললে : আমার উপর তুমি মিছেমিছি রাগ করো কেন রুবি ?

রুবি খোঁপা গোছাতে-গোছাতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সুনীলের চোখের দিকে চাইলো : কোরবো না,—আপনি এত হিংসুক যে জয়ন্তদা'র একটা কথা পর্য্যন্ত সহ্য কোরতে পারেন না ! সুধু আপনার জন্যেই ত আমি আজ অক্সফোর্ড বা'র কোরতে পারি নি।

সুনীল রুবির আরো গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে তার মাথাটি নিজের বুকের মধ্যে আকর্ষণ কোরবার চেষ্টা কোরছিলো : তুমি আমায় ক্ষমা করো রুবি, আমি তোমাকে ভালোবাসি। সত্যি, তোমার জয়ন্তদা'র চাইতেও ভালোবাসি।

হল্‌দে দুপুর

রুবির রক্তের স্রোতে বান ডাকলো। সর্ব্বাঙ্গ কেঁপে উঠলো তার। নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে' সে রুদ্র ভঙ্গিতে চীৎকার কোরে উঠলো : কী, কী বোল্‌লেন! ছি, ছি,—আমি জানতুম না, আপনার শরীরে জানোয়ারের রক্ত আছে—আমি আর আপনার কাছে পড়তে চাই না!

—রুবি, আমি তোমাকে ভালোবাসি, তুমি অমন নিষ্ঠুর হ'য়ো না,—আমি তোমাকে চাই, তুমি জয়ন্তকে ভুলে যাও—রুবির হাত চেপে ধরে' তা'কে বক্ষলগ্ন কোরবার হিংস্র বাসনায় সুনীল উন্মত্ত হ'য়ে জ্বলে' উঠলো : রুবি, তুমি আমার, তুমি আর কারো নও!

রুবির রক্তে আগুন ধরে' গেল। যন্ত্রণাময় একটি কর্কশ শব্দ উচ্চারণ কোরে সুনীলকে সজোর ধাক্কা দিয়ে সে কাঁপ্‌তে-কাঁপ্‌তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর মেঝের উপর সতরঞ্চ বিছিয়ে রুবি যখন ট্রানসক্রিপ্‌টের খাতা নিয়ে ব'সেছে অনুপমা মেয়েকে জিজ্ঞেস্‌ কোরলেন : বিলু এসে বোললে তুই মাষ্টারের সঙ্গে চোপ্‌রা কচ্ছিলি, কী হয়েছে?

অতিরিক্ত গম্ভীর হ'য়ে মেয়ে জবাব দিলো : কিচ্ছু হয় নি।··· কাল থেকে ও-মাষ্টারের কাছে আমি আর পড়বো না।

অনুপমা শঙ্কিত বিস্ময়ে মেয়ের মুখের দিকে তাকালেন কেন,

হলদে দুপুর

কী হয়েছে ? কী হয়েছে আমাকে বল্ রুবি,—বল্, কোনো ভয় নেই ।—বহুবার এই প্রশ্ন কোরেও অনুপমা মেয়ের মুখ থেকে কোনো জবাব পেলেন না ।

অনুপমা শুতে চলে' গেলে রুবি আবার জয়ন্তর সেই চিঠিগুলো টেনে বা'র কোরলো। আবার একখানা পুরোনো চিঠি পড়ে' তার তীব্র আকাঙ্ক্ষা হ'ল জয়ন্তকে খুব কড়া কোরে একখানা চিঠি লেখে, 'জনি'ই কি তোমার সব ! ট্রানসক্রিপ্‌টের খাতার পাতায় জয়ন্তর উদ্দেশ্যে বিনিয়ে-বিনিয়ে পাঁচ লাইন লিখলো—লিখে আবার কি মনে কোরে তা' ছিঁড়ে ফেললো। না, কিছুই ভালো লাগছে না তার। সেল্‌ফ্‌ থেকে টেনে নামালো একখানা য়্যাটলাস ও একখানা বাঁধানো-'মৌচাক'। বিলেত যাওয়ার আগে জয়ন্ত তা'কে এই য়্যাটলাসখানা উপহার দিয়েছিলো,—আর দিয়েছিলো একবছরের এই বাঁধানো-'মৌচাক'।···কিছুদিন আগে জয়ন্ত তা'কে নিয়ে 'মৌচাকে' একটি কবিতা লিখেছিলো—সে-কবিতাটি এর মধ্যে থাকায় রুবি এখানাকে আজো বুকে নিয়ে ঘোরে। 'মৌচাকে'র সে-কবিতাটি তার ঠোঁটস্থ। মেজাজ খারাপ হ'লে 'মৌচাকে'র গল্প পড়ে' সে তা' শুধ্‌রে নেয়—কিন্তু আজ 'মৌচাক' ছুঁতেও প্রবৃত্তি আসছে না। এম্‌নি, য়্যাটলাসখানার পাতা উল্টোতে-উল্টোতে সে গ্রেট বৃটেনের ম্যাপের উপর দৃষ্টি অবনত কোরলো। অত্যন্ত

স্বাভাবিকভাবে আবার এই প্রশ্ন জেগে উঠলো মনে, এই ম্যাপে কি অক্সফোর্ড নেই! তার ব্যগ্র চোখ গ্রেট বৃটেনের অজস্র শহর এ-পাশে ও-পাশে ঠেলে' সরিয়ে রেখে স্বধু অক্সফোর্ড হাতড়াতে লাগলো। হয়তো তার দৃষ্টি-শক্তিতে কিছু ত্রুটি এসেছে— নইলে কেন সে পাচ্ছে না অক্সফোর্ড! এই ম্যাপেই ত জয়ন্ত তা'কে অক্সফোর্ড দেখিয়ে দিয়েছিলো।

ম্যাপের ছোটো-ছোটো অক্ষরের পোকা যেন তার দৃষ্টিকে কামড়াতে লাগলো। অসহ্য ক্লান্তিতে রুবি চোখ বুজলো। নিজেকে একটু সময়ের জন্য ফাঁকায় বিলিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে তারপর আস্তে-আস্তে ছাদের উপর এসে দাঁড়ালো।

এখনও চাঁদ ওঠেনি আকাশে—বিশাল শূন্যে কালো পর্দ্দার মতো পাত্‌লা অন্ধকার ঝুল্‌ছে এখনও। রুবির ক্লান্ত চেতনায় এখনও জট পাকিয়ে আছে সেই অক্সফোর্ড। চোখ খুলতেই সে শিউরে উঠলো, অন্ধকারের মধ্য দিয়ে তার দিকে যেন তাকিয়ে আছে মিস্ মরিয়ট, মীরা দে ও তার মাষ্টারের ক্ষুধিত চোখ! রুবি দু'হাত পিছিয়ে আসতেই তা'র পায়ে ঠেকলো সেই গোলাপের টব্‌টি। টবের সামান্য স্পর্শ পেতেই সে সেই অন্ধকারের মধ্যেই তার দৃষ্টি প্রসারিত কোরে দিলে—সেই গোলাপের ডালে আবার নতুন কোনো কুঁড়ি ফুটেছে নাকি!

ঘুম

শরীর অপটু হওয়ায় সুধাময়ী সকালে একটু দেরি কোরেই বিছানা থেকে উঠতেন। কিন্তু সামান্য রাত থাকতেই তাঁর ঘুম ভেঙে যেত। সিঁড়ির উপর অজুর পায়ের শব্দ ও অস্পষ্ট গুঞ্জনে আর ঘুম আসতো না। অনেক প্রার্থনা নিয়ে, অসাড়, শিথিল হ'য়ে বিছানাকে বুকে আঁকড়ে থাকতেন কিন্তু ঘুম আর আসতো না।

অনেকক্ষণ অবধি ঘুমুবার পক্ষে তাঁর এমন-কিছু বাধা ছিলো না। সকাল অবধি বেশ আরাম ও আনন্দ নিয়েই ঘুমুতে পারতেন। কিন্তু, সামান্য রাত থাকতেই সদর রাস্তায় জল দেওয়ার শব্দে, ঘরের মেঝেয় অজুর জুতোর মস্‌মসানিতে কিম্বা তার শিস্ দেওয়াতে তাঁর ঘুম ধীরে-ধীরে পাত্‌লা হ'য়ে আসতো।

আর, ভোর পাঁচটায় অজু যখন ঢাকা-দেওয়া বাসি পরোটা খেত, আর তা' থেকে থালা গেলাসের কর্কশ শব্দ উঠতো, তখন, সেই পাত্‌লা ঘুমের মধ্যেই তিনি অস্পষ্টভাবে সব-কিছু অনুভব কোরতেন। সব-কিছুর মধ্য দিয়েই তিনি এই অবচেতনার আলস্যটুকু উপভোগ কোরতেন।

কিন্তু ঘণ্টাখানেক পরে অজু যখন 'মা আসি' বলে' বাইরে থেকে সশব্দে দরজা টেনে' বেরিয়ে যেত, সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে যাওয়ার শব্দ আসতো, সে-সময় তিনি আর কিছুতেই বিছানা আঁকড়ে শুয়ে থাকতে পারতেন না।

হলদে দুপুর

কিছুদিন থেকে সুধাময়ীর এম্‌নি হয়েছিলো। এম্‌নি ঘুমের অবচেতনায় তিনি জড়িয়ে থাকতেন অনেক এলোমেলো, অস্পষ্ট অনুভূতি নিয়ে। কতো চেষ্টা কোরেছেন এই অভ্যাস থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য, কিন্তু পারেন নি। দিন-দিন এই অভ্যাসের মধ্যে আরো ডুবে যেতে লাগলেন। বিধবা হওয়ার পর থেকে একবার তিনি বিছানায় ভেঙে প'লে আর সহজে উঠতে চাইতেন না। সব সময় ঘুমুবার উদ্দেশ্য না থাকলেও কেমন যেন জবুথবু অবস্থায় অসহায়ভাবে পড়ে' থাকতেন। একবার বিছানার নরম স্পর্শ পেলেই চোখ বুজে' কতো কি ভাবতেন, কেমন যেন হ'য়ে যেতেন।

আজও ভোরবেলা তিনি আর ঘুমুতে পারলেন না; জাগলেন সারা শরীরে, শয্যার আরাম ত্যাগ কোরে। অজুর জুতোর আওয়াজ ও জোর-জোর শিস্ দেওয়ার শব্দে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। বড়ো তাড়াতাড়িতে সে আজ চলে' গেল। অন্যদিনের মতো যাওয়ার আগে তাঁকে একটু জানিয়ে গেল না,—এই বোবা ব্যথাই সুধাময়ীকে বিশ্রীভাবে স্পর্শ কোরলো।

তিনি আর ঘুমুতে পারলেন না।

শীতের সকালে বালিসের ওপর যতক্ষণ না রোদের সোনা ঝরে' পড়তো ও দু'-একটা কাক ঘরের মধ্যে এসে এঁটো বাসনের কানায় ঠোঁট ঠুকতো, তিনি কিছুতেই বিছানা ছেড়ে' উঠতেন না।

হলুদে দুপুর

এ-পাশ ও-পাশ কোরে আলস্যের শেষতম সুখটুকু উপভোগ কোরতেন। গ্রীষ্মের সকালেও উঠতে একটু দেরি হ'ত—কিন্তু বেশি না। ভোরের তন্দ্রাজড়িত আলস্যকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে হাত-পাখা টান্‌তে-টান্‌তে শ্রান্ত হ'য়ে পড়তেন; গরমে ঘেমে উঠলে আর শোয়া চলতো না।

ঘুম থেকে উঠে সুধাময়ী ঘরের দেয়াল ধরে'-ধরে' বারান্দায় এসে ব'সলেন। দেয়াল ধরে' বাইরে আসা ছাড়া আজ আর অন্য উপায় ছিলো না। মাঝে-মাঝে বাতের বেদনায় তাঁর পা দু'খানি অচল হ'য়ে যায়।

সুধাময়ীর বয়েস হ'লেও শরীরে সামর্থ্য ছিলো, স্বাস্থ্য ছিলো। পঞ্চাশ বছরের সূর্য্য-তাপে চেহারায় এখনও যেমন ঔজ্জ্বল্য তেম্‌নি নিরেট গাঁথুনি। বাতের ব্যথায় অপটু না হ'লে সংসারের সব কাজ তিনি নিঃশব্দে নিজের হাতে সম্পন্ন করেন। প্রত্যহ বিছানা থেকে উঠেই দেখেন—অজু তাড়াতাড়িতে ক'খানা পরোটা আধ-খাওয়া কোরে রেখে গেছে, ময়লা প্যাণ্টটা পরে' গেল কিনা; দেখেন, গোয়ালা ঠিক জায়গায় ঠিকমতো দুধ রেখে গেছে কিনা। তারপর সংসারের খুঁটিনাটি, রান্নার চেষ্টা ও আরোও অনেক-কিছু। আজ তিনি অচল। আজকের জন্যে তাঁর সংসারে ঠিকে-ঠাকুর আছে। সেই সব কোরবে।

যেখানে অজু ছুটির দিনে ইজিচেয়ারে গা' ডুবিয়ে বই পড়ে,

সুধাময়ী বারান্দার সেই কোণে গিয়ে ব'সলেন। বসে' মনে-মনে উচ্চারণ কোরলেন অজুর কথা।

তাঁর শেষ বয়সের একমাত্র সন্তান অজয়। অজয় ছেলেমানুষ। মানুষ-হওয়ার ক্লেশকর তপস্যায় তা'কে ভোর পাঁচটায় বাসি পরোটা নাকে-মুখে গুঁজে ছুটতে হয় কোন্নগরে, বাটা-স্যু-ফ্যাক্ট্রীতে। তাদের সংসারে তা'র মা আর সে। সুধাময়ী আর অজয়। সুধাময়ী যখন অপটু হ'য়ে পড়েন তখন তাদের সংসারে সাময়িকভাবে তৃতীয় ব্যক্তি কেউ প্রবেশ করে। তাদের সংসারে সুধু তা'রা দু'জন।

দু' বছরের ছেলে কোলে নিয়ে সুধাময়ী বিধবা হন। দীর্ঘ আঠারো বছর এই একটিমাত্র সন্তানের চোখের দিকে তাকিয়ে আছেন—যদি সে বুঝতে পারে, যদি অজয় তা'র মা-কে চিনতে পারে।...তাঁর আত্মীয় স্বজনের সংখ্যাও বিশেষ কম ছিলো না যখন স্বামী জীবিত ছিলেন, যখন পুরোমাত্রায় তাঁদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ছিলো। এখন আত্মীয়ের ভিড় হাল্‌কা হ'য়েছে,—ভাব্‌তে সুধাময়ীর সময়-সময় ভালোই লাগে।

সকাল পাঁচটা, কিম্বা সাড়ে পাঁচটায় অজয় রোজ স্যু-ফ্যাক্ট্রীতে চলে' যায়। তারপর সারাদিন সেখানে মানুষ-হওয়ার কঠিন সাধনায় নিজের মনে-মনে কাঁদতে থাকে; আট ঘণ্টা চলন্ত মেশিনের সুমুখে দাঁড়িয়ে থাকায় হাঁটু ভেঙে আসে।

তবু সে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে মেশিনের গালের মধ্যে একটার পর একটা রবারের টুক্‌রো ঢুকিয়ে দিতে থাকে।

উপায় নেই। এই জীবনই তার বেশ লাগে। দুঃসহ ক্লান্তির মধ্যে এই জীবনই বেশ লাগে, যখন চোখ বুজে' সে দেখতে পায় জননীর শুভ্র বিধবা মূর্ত্তি তার দিকে করুণভাবে তাকিয়ে আছে ভবিষ্যতের সহস্র ইচ্ছা, সহস্র স্বপ্ন নিয়ে।

বারান্দার সেই কোণে বসে' সুধাময়ী অনেক-কিছু ভাবলেন। মনে-মনে উচ্চারণ কোরলেন অনেক কথা। সবশেষে, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানালেন,—নির্ব্বিঘ্নে অজু বাড়ী ফিরে আসুক্।

তিনি জানতেন, শীতের দিনে সে সন্ধ্যে ছ'টায় ফেরে, আর বসন্তে রাত্রি ন'টা দশটার পূর্ব্বে আসে না,—ফ্যাক্ট্‌রী থেকে বাড়ী ফিরবার পথে হয়তো কোনো ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সাথে দেখা হ'য়ে যায়, নতুবা যায় কোনো সিনেমাতে। আজ তিনি এই সকালেই তার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে পড়লেন। এখন থেকেই ভাব্‌তে সুরু কোরলেন, কতোক্ষণে সে বাড়ী ফিরে আসবে।

জ্যৈষ্ঠের এই দীর্ঘ দিন, কেমন কোরে কাটবে এত সময়—এ-কথা ভেবে তিনি কেমন-একটু ক্লান্তি অনুভব কোরলেন। অন্যদিন হ'লে সংসারের সব কাজ সেরে কোনো-না-কোনো ফেলে-রাখা সেলাই-এর কাজে হাত দিতেন, কিম্বা অতি যত্নে ছেলের টেব্‌ল গুছিয়ে রাখতেন, তার বেড়াতে যাওয়ার স্যু-তে

পালিশ লাগাতেন,—নতুবা, মেঝের উপর আঁচল বিছিয়ে শুয়ে চোখ রাখতেন মাসিক খরচার খাতায়। আবার যখন এ-সব কিছুই ভালো লাগতো না,—পায়ে ব্যথা না থাকলে—সোজা চলে' যেতেন পাশের বাড়িতে। গিয়ে গল্প কোরতেন এটা-ওটা নিয়ে। কিন্তু তিনি আজ অচল, জ্যৈষ্ঠের দিনও দীর্ঘ। অন্যদিন হ'লে রান্নার ব্যাপারে এই বিকল মনকে ঘুরোতে পারতেন কতকটা; কিন্তু আজ ঠাকুরকে একবার ডেকেও জিজ্ঞেস্ কোরলেন না, এ-বেলা কী-কী খাবার তৈরি হচ্চে। মোটের উপর, তাঁর কিছুই ভালো লাগছে না। বড়ো তাড়াতাড়িতে অজয় চলে' গেল, যাওয়ার আগে আজ মা-কে একবার জানিয়ে গেল না,—এই বোবা ব্যথাই বার-বার বিশ্রীভাবে তাঁকে স্পর্শ কোরতে লাগলো।

দুপুর বেলা সুধাময়ী আর-আর দিনের মতো চোখে চশমা এঁটে একটা সেলাই নিয়ে ব'সলেন।

সেলাইটা শেষ হ'ল। তারপর, তিনি অজয়ের জামার বোতাম বদলাতে গিয়ে দেখেন, সে আজ হাফ্‌শার্ট না পরে' পূরো-হাতার কামিজটি গায়ে দিয়ে গেছে। আর তাঁর ভালো লাগলো না। কোনো এক অশুভ সঙ্কেতে মন অস্থির হ'য়ে উঠলো।

হলদে দুপুর

তিনি দেখলেন, একটি বিপদ তাঁর দিকে যেন নিষ্ঠুরভাবে তাকিয়ে আছে। জামায় বোতাম আঁটতে-আঁটতে আঙুলগুলো কেঁপে উঠলো, দুর্ব্বল হ'য়ে পড়লো ; স্থঁচের ধারালো ডগা দু'-একবার আঙুলের মধ্যে ফুটেও গেল। সত্যিই স্থধাময়ীর আর ভালো লাগলো না।

হাফ্‌শার্টটার দিকে চেয়ে তিনি নিজের মনে উচ্চারণ কোরলেন: সর্ব্বনাশ! নিষেধ করা সত্ত্বেও আজ আবার অজু পুরো-হাতার কামিজটি গায়ে দিয়ে গেছে। একটু অন্যমনস্ক হ'লেই মেশিনের ছুটন্ত কল-কব্জায় কখন ঐ জামার ঢিলে হাতা চিম্‌টে যাবে ও তা' থেকে সেকেণ্ডের মধ্যে হাতখানিতে টান পড়বে, তারপর—, সর্ব্বনাশ, আর তাঁর কল্পনা এগুতে পারে না। ঘরের জান্‌লাগুলো খুলে দিলেন বাইরে তাকাবেন বলে', বাইরের ব্যস্ত পৃথিবীর উপর দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়ে এই সব অশুভ চিন্তা থেকে মুক্তি পাবেন।

জান্‌লা খুললেই নজর পড়ে টেলিফোনের তার ও রাস্তার একটি বকুল গাছের উপর। রাস্তার ও-পাশে একটি নোংরা পোড়ো-জমিতে কয়েকটা মহিষ চোখ বুজিয়ে পরম স্থখে জল-কাদার নরম শীতলতা উপভোগ করে, আর তাদের কালো মসৃণ পিঠের উপর দু'-একটা দাঁড়কাক নানান্‌ ভঙ্গিতে নাচতে থাকে, কখনো বা কানের মধ্যে ঠোঁট ঢুকিয়ে স্থড়্‌স্থড়ি দেয় ;—জান্‌লা

খুললে এই ধরণের কতো কী দেখা যায়। সুধাময়ী সব দেখলেন কিন্তু মানসিক গতির একটুও মোড় ফেরাতে পারলেন না।

আবার ভাবলেন, সে আজ টিফিনের পয়সা নিয়ে গেছে কি না কে জানে। ওম্‌লেট খেতে ভালোবাসে সে। কিন্তু এই নিদারুণ গ্রীষ্মে ডিম খাওয়া আর উচিত নয়। ছেলেমানুষ, হয়তো এ-সব বোঝে না ভালো কোরে,—কি জানি, দোকানের খারাপ ডিম খেয়ে যদি অসুখ হয়! এই রকম অনেক চিন্তায় তিনি সঙ্কুচিত হ'লেন, ম্রিয়মাণ হ'লেন। তাঁদের সংসারে মাত্র তাঁরা দু'জন। একজনের অসুখ হ'লেই আর একজনের অনিবার্য্য অশান্তি। অস্থির মন কিছুতেই শান্ত হ'ল না। তবু, তবু তিনি নিঃশব্দে সব সহ্য করেন—তাঁর অজয় যদি মানুষ হয়,—তার মা-কে যদি সে চিনতে পারে।

স্মরণ কোরলেন তিনি কোনো-একদিনের কথা, যেদিন অজয় আবদারের সুরে বোলেছিলো: মা, কেমন কাজ শিখলাম তুমি তা' দেখবে না? অজয় এক ছুটির দিনে তাঁকে তাদের ফ্যাক্‌ট্‌রী দেখাতে নিয়ে যাবে বোলেছিলো, কিন্তু গড়িমসি কোরে এ-পর্য্যন্ত তা' আর ঘটে' ওঠে নি।

দুপুর বেলা কোনো-কোনো খুচ্‌রো কাজ হাতে নিয়ে সুধাময়ী মনের লাগাম হারিয়ে ফেলেন। কল্পনায় দেখতে পান একটি বিরাট জুতোর কারখানা; অনেক কল-কব্জা, অনেক লোক

সেখানে। দেখতে পান, তাঁর অজু টিফিনের সময় ভিড়ের মধ্যে একটি বড়ো ঘর থেকে ঘাম্‌তে-ঘাম্‌তে বেরিয়ে আসছে। তার জামায়, হাতে-মুখে কালির দাগ ও ময়লা; ময়লা না ধুয়েই সেই হাতে রাস্তার ধারের দোকানে খাবার খেতে ঢুকে যায়। কিছু বাদেই এসে আবার নিজের কাজে মন দেয়। বাড়িতে চঞ্চল হ'লে কি হয়, কারখানায় নিজের কাজের উপর সে বড়ো মনোযোগী। বড়ো সাহেব তার উপর খুব সন্তুষ্ট, খুব ভালোবাসে তা'কে।—এম্‌নি চিন্তা কোরে সুধাময়ী খুসী হন। সময়-সময় সেই জুতোর কারখানা ও ছেলের কাজ দেখতে তাঁর প্রবল ইচ্ছা হয়।

স্মরণ কোরলেন তিনি এই সেদিনের কথা। সেদিনও অজয় তাঁকে আবদারের স্বরে বোলেছিলো: সব চাইতে ভালো এক-জোড়া লেডিজ্‌-স্যু আমি এবার উপহার পাবো, মা; তোমাকে তা' পরতে হবে। শীতের দিনে ঠাণ্ডা সীমেণ্টে তোমার যা কষ্ট হয়!

—তা' কি হয় পাগল! তোর মা-কে দেখে সকলে যে হাসবে তা'হলে—সুধাময়ী হেসে এই জবাব দিয়েছিলেন।

অজয়ের অসম্ভব রকমের ইচ্ছা ছিলো যে তার আত্মীয়দের একদিন ফ্যাক্ট্‌রী দেখিয়ে নিয়ে আসে, ফ্যাক্ট্‌রীর এক জোড়া জুতো কাউকে উপহার দেয়। সত্যি বোলতে গেলে,

তাদের আপনার জন বড়ো কেউ ছিলো না। ভগবান তা'কে একটি ছোটো বোন্ পর্য্যন্ত দেন নি,—ভেবে' অজয় দুঃখিত হ'ত।

প্রায়-দুপুরে সুধাময়ী এম্নি যন্ত্রণা পেতেন। প্রায়-দুপুরেই তাঁর বিশেষ-কিছু খাওয়া হ'ত না। অপটু শরীরকে তবুও তিনি অক্লেশে বহন কোরতেন। তবু তাঁর ক্ষমতা ছিলো। নিজের প্রশান্ত পরিমণ্ডলের কেন্দ্রে, বৈধব্যের পবিত্র শুভ্রতায় তিনি দৃঢ়, কঠিন হ'য়ে ছিলেন। অনেক বিপদের ছায়া, ছোটো-ছোটো অশান্তির ধূসর মেঘ, অনেক মলিন সূর্য্য তাঁকে স্পর্শ কোরেছে, তবু তিনি নেমে আসেন নি, সংকল্পের দৃঢ়তা থেকে এতটুকু বিচ্যুত হন নি।

রোদ নরম হ'য়ে এল, এবং দেখতে-দেখতে ঘরের মেঝেয়, তারপর বকুল গাছের ডালে, ও শেষে দূরের গির্জ্জের চূড়োয় গিয়ে তার নাচন থামলো। সুধাময়ী বসে' ব'সেই কোনোরকমে ঘরটি পরিষ্কার কোরলেন। সন্ধ্যে হবে এখুনি। ঠাকুর নিচে রান্না কোরতে গেলে তিনি ঘরের আলো জ্বেলে' একা চুপ কোরে বসে' থাকেন। উনিশ বছর আগে ঠিক এম্নি সময় ছেলের চোখে কাজল পরাতেন, দুধ খাওয়াতেন, আর গুন্-গুন্ কোরতেন কোনো ছেলে-ভুলোনো গানের একটি চরণ নিয়ে।

উনিশ বছর আগের দু'-একটি সন্ধ্যার কথা কোনো-কোনো কাজের মধ্যে তাঁর মনে পড়ে।···ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে নিজে

কলঘরে চলে' যেতেন। তারপর মনোহর উপায়ে চলতো চুল-বাঁধা আর আনুসঙ্গিক প্রসাধন। গানের মৃদু গুঞ্জন নিয়ে আর্শীর সুমুখে বহুবার ঘুরে-ফিরে দাঁড়ানো কচিৎ তাঁর মনে পড়ে। একমাত্র দুগ্ধপোষ্যের মুখ চেয়ে রাত্রে স্বামী-স্ত্রীর কতো জল্পনা, কী সে উদ্বেলিত আকাঙ্খা! সুধাময়ী স্বামীকে বোলতেন: দেখো, এ নিশ্চয়ই বড়ো উকিল কিম্বা ব্যারিষ্টার হবে।

ঘরের আলমারীগুলোর দিকে তাকালে, দেওয়ালের ফোটোর উপর চোখ পড়লে সুধাময়ী এলোমেলোভাবে এইসব ভাবতেন আর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলতেন। শরীর ভালো থাকলে মাঝে-মাঝে স্বামীর আইনের বইগুলি রোদে দিতেন, আবার পরম যত্নে সেগুলিকে ঝেড়ে'-মুছে তুলে রাখতেন আলমারীতে। ভাগ্যের কথা স্মরণ কোরে এম্‌নি সব দীর্ঘ নিঃশ্বাসকে চাপা দিতেন সে-সময় আর অস্বাভাবিকভাবে নিজেকে শক্ত কোরতেন, কঠিন হ'তেন—তাঁর অজয় মানুষ হবে।

সন্ধ্যের পরে ঘরে আলো জ্বেলে' তিনি রোজ একা চুপ কোরে বসে' থাকেন। কিন্তু ইদানীং কী বিশ্রী অভ্যেস হয়েছে তাঁর! সন্ধ্যের পর একা একটু বসে' আছেন, কি কোনো বই খুলে' দেখছেন, অম্‌নি তন্দ্রা আসে। যেখানে-সেখানে যা'-তা' ভঙ্গিতে এলিয়ে পড়েন। ঠিক ঘুম নয়, অথচ কেমন যেন এক

অবস্থা। তাঁর লজ্জা করে এই দুর্নিবার ব্যাধির কথা স্মরণ কোরে। লজ্জা করে, অথচ কোনো উপায়েই এই পাত্‌লা ঘুমের জড়িমাকে শাসন কোরতে পারেন না।

সন্ধ্যের কিছু আগে তিনি দেয়াল ধরে'-ধরে' আবার বারান্দার কোণে গিয়ে ব'সলেন। সদর রাস্তার গাড়ী-ঘোড়ার শব্দে তাঁর বিশেষ-কিছু আসে যায় না। তিনি স্বধু আকাশের দিকে স্থিরনেত্রে তাকিয়ে থাকেন, প্রথম নক্ষত্র ফুটে উঠবার সাথে-সাথেই দু'হাত জোড় কোরে এক অজানা পুরুষের উদ্দেশ্যে নমস্কার করেন; প্রার্থনা করেন: তাঁর অজয় মানুষ হোক্।

অন্ধকার ঘন হ'য়ে আসে। তবু, বারান্দার সেইখানেই চোখ বুজে বসে' থাকেন, উন্মুখ হ'য়ে থাকেন, কখোন্ সিঁড়ির উপর অজয়ের পায়ের শব্দ শুনতে পাবেন। আজ আর ঘুমুবেন না, দৃঢ়ভাবে মনে-মনে এই প্রতিজ্ঞা কোরেছেন। ছেলে ফিরে না-আসা পর্য্যন্ত তাঁকে আজ জেগে থাকতে হবে, যে-কোনো উপায়ে। আজ অজয়কে তিনি বোলবেন, সে যেন আর ফুলশার্ট না পরে' যায়, এই গরমে দোকানের বাসি ডিম না খায়। অন্তত, এই কথা বলার জন্যও তাঁকে জেগে থাকতে হবে।

সুধাময়ী চোখ বুজে বসে' আছেন সেইখানে আর মাঝে-মাঝে সশব্দে হাই তুলছেন। হঠাৎ সিঁড়িতে কা'র পায়ের শব্দ শুনে' তন্দ্রা ছুটে গেল। দেয়াল ধরে' উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস কোরলেন: কে, অজু এলি নাকি?

হল্‌দে দুপুর

গোয়ালা দুধ দিয়ে গেল উপরে। তিনি চোখ বুজে' পুনরায় সেখানে বসে' রইলেন। পুনরায় তন্দ্রা এল। তবু, তিনি আজ কঠিন হওয়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা কোরছেন। তাঁকে আজ জেগে থাকতেই হবে। যে-কোনো উপায়ে।

একটু তন্দ্রা আসে, একটু ঢুলে' পড়েন, আবার সোজা হ'য়ে বসেন। এম্‌নি কোরে খানিক সময় কাটলো।

সিঁড়িতে আবার কা'র পায়ের শব্দ শুনে' তিনি উঠে দাঁড়ালেন। নিজের মনে নিশ্চয় হ'লেন, যাক্‌, অজু এল এতক্ষণে। বোললেন : আজ এত দেরি কেন মণি ?

'আমি মা' বলে' ঠাকুর নিচে থেকে উপরে খাবার রাখতে এল। সে ফিরে চলে' গেলে সুধাময়ী বারান্দা থেকে ঘরের মধ্যে এলেন। ঘরের দরজা খোলা রেখে বাইরে এম্‌নিভাবে বসে' থাকতে তাঁর সাহস হয় না। যদি ঘুমিয়ে পড়েন! সুতরাং ঘরের মেঝের উপর বসে' দুই হাতের আঙুল মট্‌কাতে থাকেন, ঘন-ঘন হাই তোলেন ও মাঝে-মাঝে ঢুল্‌তে থাকেন। কেবল সন্ধ্যে বেলা আর ভোরের সময়েই তিনি এম্‌নি জবুথবু হ'য়ে পড়েন। ঘুম যে খুব বেশি আছে তা' নয়। রাত্রে দশবার বিছানা থেকে ওঠেন, ছট্‌ফট্‌ করেন কি-এক অস্বস্তিতে। ওই কেমন যেন এক অবস্থা!

এখুনি অজয় আসবে,—এই আশায় তরল তন্দ্রার মধ্যেও তিনি আজ উৎকর্ণ হ'য়ে রইলেন। এইভাবে অনেকক্ষণ

হলুদে দুপুর

তন্দ্রাচ্ছন্ন থাকার পর বসে' থাকতে তাঁর ভয়ানক কষ্ট হ'তে লাগলো।

রাত্রি ন'টা বাজলো। আর উপায় নেই। সুধাময়ীর চোখ অত্যন্ত ভারী হ'য়ে এল, চোখের দু'পাতা ঘুমের আঠায় জড়িয়ে গেল। আর উপায় নেই। নিজের উপর বহুবার জোর কোরলেন তিনি, অনেক বিদ্রোহ কোরলেন ঘুমের বিরুদ্ধে; শেষপর্য্যন্ত লজ্জিত হ'লেন, পরাজিত হ'লেন। আর এক মিনিট জেগে থাকা বোধহয় সম্ভব হবে না।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল আবার।

গভীর তন্দ্রার ভিতর থেকে সুধাময়ী ভোর বেলার মতো শুনতে পেলেন সিঁড়ির উপর জুতোর শব্দ কোরতে-কোরতে, জোরে শিস্ দিতে-দিতে অজয় আসছে। তিনি বাঁচলেন।

কিন্তু তাঁর নিদারুণ লজ্জা, এই পাত্‌লা ঘুমের জড়তা থেকে তিনি আর উঠতে পাচ্ছেন না। দরজা ঠেলে' অজয় জুতোর মস্‌মসানিতে ঘরে ঢুকলো, জুতো খুল্‌লো, জামা প্যাণ্ট্‌ ছাড়লো,—গভীরভাবে অবচেতনার মধ্যে সবই অনুভব কোরলেন। আর বহু কষ্টে, বহু শক্তি সঞ্চয় কোরে ঘুমের আঠা থেকে চোখ ছাড়িয়ে অজয়ের দিকে একবার তাকালেন,—সত্যিই অজয় এসেছে।

অজয় এসেছে দেখে সুধাময়ী নিশ্চিন্ত হ'লেন বটে, কিন্তু তা'কে তাঁর সংকল্পিত কিছুই বলা হ'ল না। অনেক চেষ্টা কোরলেন ঠোঁট খুলতে, কিন্তু ঘুমে তাঁর চোখ আর ঠোঁট দুই-ই আট্‌কে আসছে।

মদন ভস্মের পর

ব্লাউজটা অসমাপ্তই রইলো। তাড়াতাড়িতে রমা তার বাবার জন্যে এক জোড়া মোজা বুন্‌তে বসে' গেল। এই মোজা জোড়াটি শেষ কোরে সে যখন তার বাবার হাতে সযত্নে তুলে দেবে তখন তিনি খুসিতে না-জানি, কতো উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠবেন। রমার কৃশ আঙুলগুলির নিখুঁত ভঙ্গিতে বুননের কাঠি দু'টি রঙিন্ উল্ মুখে নিয়ে দ্রুত ওঠা-নামা কোরতে লাগলো। মনে হয়, উলের ঘন ফাঁসের মধ্যে তার চঞ্চল মন এইবার নিশ্চয়ই বন্দী হবে।

কিন্তু এম্‌নিভাবে আর কতোক্ষণই বা! নির্জলা একাদশীতে চঞ্চল মনকে ভুলিয়ে, না-হয় বড়ো জোর ধম্‌কে রাখা যায় কিছুক্ষণ—কিন্তু শরীরের শিরা-উপশিরাগুলো সমস্ত শাসনের বাঁধন ছিঁড়ে একটুতেই শিথিল হ'য়ে পড়ে। অনেকক্ষণ এক জায়গায় একই ভাবে বসে' থেকে উপবাসী রমার হাতে-পায়ে ঝিঁ-ঝিঁ ধরার উপক্রম হ'ল। কাঠি থেকে উল্‌টা একবার ছিঁড়ে যেতেই সে সটান্ উঠে দাঁড়ালো। মোজা বোনা আর হ'ল না।

আশ্চর্য্য, এই একাদশীর দিনে মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্যেও ক্লান্ত শরীরের ভাগ্যে পরিপূর্ণ বিশ্রাম নেই। কা'র সাধ্য, চঞ্চল মনের দৌরাত্ম্যে একটু বাধা দেবে! সময়-সময় বিরক্ত হ'য়ে রমা নিজেই নিজের স্বভাবকে চিম্‌টি কাটে, নিজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে—কিন্তু চঞ্চল মন সব সময়ই অপরাজিত থাকে শেষপর্য্যন্ত।

হল্‌দে দুপুর

এটা থেকে ওটা, ওটা থেকে সেটা—কোনোটাতেই তার মন ভালোভাবে এঁটে ব'সছে না। অথচ, যতক্ষণ না চোখে ঘুম জড়িয়ে আসছে, একটা-কিছু নিয়ে থাকা চাই-ই তার! জিভ্‌ শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে গেছে, গা' এলিয়ে আসছে—তবুও সেই চঞ্চলতার বিরতি নেই। মোজা বোনা ফেলে রেখে ঘরের কোণে গিয়ে রমা অনেক দিনের পুরোনো একটা ট্রাঙ্ক্‌ খুলে ব'সলো। অনেক দিনের একটা পুরোনো ট্রাঙ্ক্‌—তার মা মরে' যাওয়ার পর থেকে কেউই আর সেটার দিকে ততো লক্ষ্য করে নি। আশ্চর্য্য! সেই ট্রাঙ্ক্‌টা নজরে আসতেই রমার মনে একটা নতুন কৌতূহল জেগে উঠলো।

শীতের রাত। ন'টা বেজে যাওয়ার সাথেসাথেই প্রকাণ্ড বাড়ীর চারদিকে কুয়াশার দেয়াল গড়ে' উঠেছে। বাড়ীর ভিতরেও জমাট নিস্তব্ধতা। একতলায় ঠাকুর ও চাকর অবসন্ন দেহ নিয়ে ঝিমুচ্ছে—গৃহকর্ত্তা পবিত্র চৌধুরি স্টুডিয়ো থেকে বাড়ী না ফেরা অবধি তাদের চোখে ঘুম আসা নিষেধ।

দোতলার বারান্দা থেকে দূরের ট্রাম-লাইন দেখা যায়। রাত্রে পবিত্র চৌধুরির বাড়ী ফিরতে একটু দেরি হ'লেই রমা বার-বার ঘর ও বারান্দা কোরতে থাকে। দশটা, কি বড়ো জোর সাড়ে দশটার মধ্যে যদি তার বাবা বাড়িতে না ফিরলেন তবে আর তার ব্যাকুলতা দেখে কে! পাঁচ মিনিট অন্তর তখন

সে ক্লকের দিকে তাকাবে আর ঠাকুর-চাকরকে হাঁক-ডাক দিয়ে জিজ্ঞেস্ কোরবে,—কর্ত্তাবাবু স্টুডিয়ো থেকে কোনো খবর পাঠিয়েছেন কি !

নতুন কৌতূহলের ছোঁয়া লাগায় রমা আজ ক্লকের দিকে তাকাতে ভুলে গেছে।

ট্রাঙ্কের ডালা খুলতেই অনেকগুলো দুঃখময় স্মৃতি কথা ক'য়ে উঠলো। অনেকদিন পরে রমা তার মা-র মুখোমুখি হ'ল। একটা উত্তাল নিঃশ্বাসের ঢেউকে বুকের মধ্যে চূর্ণিত কোরে সে ট্রাঙ্কের এটা-ওটা নিয়ে উদাসভাবে দেখতে লাগলো। সত্যি, কী উৎসাহ তার ! কতো রহস্য যেন ঐ ট্রাঙ্কের মধ্যে লুকোনো আছে ! এক-একটি কোরে সে সব খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো।

এই দুঃখের আবহাওয়াতেও এক ঝলক্ হাসি তার চোখে-মুখে ছড়িয়ে পড়লো। সে হাসলো তার মা-র সঞ্চয়ী স্বভাবের কথা ভেবে : পুরী-থেকে-আনা সেই ঝিনুক্‌গুলো আজো সযত্নে সাজানো আছে—এক গাদা আতরের শিশি আর বাজে কাগজ-পত্রের স্তূপে ট্রাঙ্ক্‌টি ঠাসা।

একখানা বই হাতে তুলতেই তার ভিতর থেকে খানকয়েক খামের চিঠি ছড়িয়ে পড়লো। কবেকার চিঠি, কা'র চিঠি কিছুই ঠিক নেই—কিন্তু তার মা কতো না যত্নে সেগুলোকে গুছিয়ে রেখেছিলেন !

এগুলো হয়তো তার মা-র নিজস্ব চিঠি। তার পক্ষে সেগুলো খুলে দেখা কি ঠিক হবে! শেষপর্য্যন্ত অদম্য কৌতূহল আর গোপন ইচ্ছার অন্তরালে সমস্ত সঙ্কোচ আত্মগোপন কোরলো। রমা খাম থেকে একখানা চিঠি বা'র কোরে নিয়ে পড়তে স্নুরু কোরে দিলো।

হ্যাঁ, তার মায়েরই চিঠি। কিন্তু এ কী,—চিঠির ঠিকানা আর সম্বোধন দেখেই রমার কপালের রেখাগুলো কুঞ্চিত হ'য়ে উঠলো, দীপ্তিময় মুখমণ্ডলে ফুটে উঠলো একটা রূঢ়, কর্কশ অভিব্যক্তি। এ কী,—এ-চিঠি ত তার মা-র হ'তেই পারে না, কখনোই এ সম্ভব নয়। দু' লাইন পড়তেই বুকের মধ্যে একটা অতি জঘন্য সন্দেহ দুলে উঠলো। ছি, ছি,—মা-র সম্বন্ধে এম্‌নি সন্দেহ করা পাপ। মা-র চরিত্রে কলঙ্কের আঁচড়—ছি, ছি,—এ কল্পনা করাও রীতিমতো মহাপাপ।

তারপর, চিঠিখানা শেষ পর্য্যন্ত পড়ে' দেখে রমা কিছুক্ষণ পাথরের মতো নিশ্চল হ'য়ে রইলো। এইবার সেই সন্দেহের ফণা তার হৃদ্‌পিণ্ডে দংশন কোরলো। একটা কুৎসিত সত্য তার মুখের সমস্ত রক্ত শুষে নিলো। উঃ, কী ঘৃণা আর কী লজ্জা! রমার শরীরে একটা উদ্বেল যন্ত্রণার স্রোত পাক্ খেতে লাগলো।

দরজায় খিল এঁটে দিয়ে এসে আবার সে চিঠিগুলো নিয়ে

ব'সলো। আরও কয়েকখানা চিঠি পড়ার পর মা-র চরিত্র বুঝতে আর এতটুকুও বাকী রইলো না। আধঘণ্টা আগেও যে-মাকে উঁচু আদর্শের আসনে বসিয়ে রেখেছিলো—মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত অবধি তার নিখুঁত অভিনয়ের কথা কল্পনা কোরে সে একেবারে হতভম্ব হ'য়ে গেল। সকলের চোখে ধূলো দিয়ে পনেরো থেকে পঁয়তাল্লিশ বছর বয়েস পর্য্যন্ত একটি স্ত্রীলোক স্বামীর ঘর কোরে কী সহজেই না সতীত্বের সার্টিফিকেট নিয়ে গেছে। উঃ, এই স্ত্রীলোকটিই তা'কে গর্ভে ধারণ কোরেছিলো—অসহ্য ঘৃণায় মনে-মনে রমা কুঁকড়ে উঠলো। তার ভাবতে আরো আশ্চর্য্য লাগে —এই দীর্ঘ তিরিশ বছরের মধ্যেও তার বাবা নিজের স্ত্রীকে চিনতে পারেন নি!

এর পর, বাবার কথা ভাবতে রমার রীতিমতো কান্না পায়! সহজ, সরল মানুষটি এতদিন শুধু মসৃণ জীবন-ধারণের ছবি আঁকতেই ব্যস্ত ছিলেন—এক মুহূর্ত্তের জন্যও স্ত্রীর প্রেমে কালকূটের আস্বাদ পান নি। বরং, পবিত্র চৌধুরি স্ত্রীর হাতেই নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পন কোরেছিলেন। দীর্ঘকালের পরিতৃপ্ত জীবন-ধারণ—আশ্চর্য্য, একবিন্দু অবিশ্বাস বা প্রতারণার সন্দেহ সেখানে উঁকি দিতে পারে নি।

কিন্তু কে এই সুচারু? মা-র সঙ্গে তার কোত্থেকে, কেমন কোরে যোগাযোগ ঘটলো—একটা কল্পিত ঘটনার সুতো ধরে'

রমা অনেকদূর এগিয়ে যায়,—কিন্তু কোনো নিশানায় পৌঁছুতে পারে না। কয়েকখানা পত্র থেকে সে সুধু এইটুকু জানতে পারলো যে, গত মহাযুদ্ধের সময় তার মা-র সমস্ত অনুরোধ ও নিষেধ উপেক্ষা কোরে সুধু চাকুরীর লোভেই সুচারুকে মেসোপোটিমিয়ায় যেতে হয়েছিলো। মেসোপোটিমিয়ায় থাকতে সে তার মা-কে প্রতি পত্রে এই বলে' আশ্বাস দিয়েছে যে, দেশে ফিরে এসে তা'রা দু'জনে যে-কোনো উপায়েই হোক্ একসঙ্গে বাস কোরবে।

কবে মহাযুদ্ধ শেষ হ'য়ে গেছে। সুচারু জীবিত অবস্থায় দেশে ফিরেছে বলে' মনে হয় না—কারণ, য়্যামারা থেকে বাগ্‌দাদে চলে' যাওয়ার পর আর তার কোনো চিঠি-পত্র নেই।

ঈশ্বরের অসীম অনুগ্রহ যে সুচারু দেশে ফেরে নি,—রমা ভাবতে লাগলো। তার মা-র জীবিতাবস্থায় সে দেশে ফিরলে কী সাঙ্ঘাতিক কেলেঙ্কারীই না হ'তে পারতো! সমাজের মুখে একটা কুৎসিত দাগ দিয়ে যেতে তা'রা হয়তো ইতস্তত কোরতো না। একটা বনেদী বংশের ভিৎ আল্‌গা হ'য়ে গিয়ে সমস্ত সুনাম ও কীর্ত্তি ভেঙে-চুরে পড়তো। ভীষণ আঘাত সহ্য কোরতে না পেরে পবিত্র চৌধুরিও মারা যেতেন।···রমার মস্তিষ্কে যেন একটা রক্তের চাপ ক্রমশ উঁচু হ'য়ে উঠছে। দ্বিচারিণী মা-কে স্মৃতি থেকে এখুনি মুছে ফেলতে না পারলে সে হয়তো মূর্চ্ছা যাবে।

হলদে দুপুর

ক্লকে এগারোটা বাজ্‌তেই রমার চেতনা হ'ল যে তার বাবা আজ এখনো স্টুডিয়ো থেকে ফেরেন নি। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে, ট্রাঙ্ক টা পা দিয়ে একটু সরিয়ে রেখে সে বারান্দায় এসে দাঁড়ালো।

কুয়াশার ঘন পর্দ্দা ঠেলে' বাইরের কোনো-কিছুই আর দেখা যায় না। ট্রাম-রাস্তা থেকে মাঝে-মাঝে দু'-একখানা মোটরের শব্দ কানে আসে। সাময়িকভাবে চিঠির কথা মন থেকে মুছে ফেলে রমা তার বাবার প্রতীক্ষায় সাগ্রহে পথের দিকে তাকিয়ে রইলো।

স্টুডিয়ো থেকে ফিরতে পবিত্র চৌধুরির কোনো দিন ত এত দেরি হয় না! রাত দশটার পর তাঁর ত বাইরে থাকার কথা নয়! বেশি রাত অবধি কোনো ছবির স্যুটিং থাকলে তিনি ত উপস্থিত থাকেন না! আর, কোনো কারণে উপস্থিত থাকলেও বাড়িতে ত আগেই খবর পাঠান! রমা বিশেষ চিন্তিত হ'য়ে বার-বার নিজের মনকে প্রশ্ন কোরতে লাগলো,—কেন আসছেন না এখনো।

মা-র মৃত্যুর পর থেকে বাবাকে চোখের আড়াল কোরে একদিনের জন্যও সে শ্বশুর-বাড়িতে যায় নি,—আর, পবিত্র চৌধুরিও তাঁর একমাত্র সন্তান রমার উপর বৃদ্ধ বয়েসের বাকী দিনগুলোর ভার দিয়ে পরম নিশ্চিন্ত। সমস্ত সংসারটি স্বধু এই

বাপ ও মেয়ের স্নেহ-মমতাকে কেন্দ্র কোরে দাঁড়িয়ে আছে। পবিত্র চৌধুরি দীর্ঘ দিনের পরিশ্রমে যে প্রচুর অর্থ অর্জ্জন কোরেছিলেন তা' যে একটি পরিবারের বিশেষ কোনো কাজে এল না—এইটাই তাঁর সব চাইতে বড়ো দুঃখ। প্রিয়তমা স্ত্রীর মুমূর্ষু অবস্থায় তাই তিনি ক্ষোভ মিটিয়ে দু'হাতে টাকা খরচ কোরলেন, নিজের শরীর থেকে ওজন মেপে রক্ত দিলেন। কিন্তু কোনো-কিছুতেই ফল হ'ল না। স্ত্রীর মৃত্যুর পর সমস্ত অর্থ তাঁর কাছে একেবারে জলীয় মনে হ'তে লাগলো। শরীর ও মনে ভাঙন্ ধরলো রীতিমতো। আত্মীয়-বন্ধুরা পরামর্শ দিলেন, একটা-কিছুতে লিপ্ত না থাকলে পবিত্র চৌধুরি সত্যিই পাগল হ'য়ে যাবে।

সে-সময় ফাটল্-ধরা সংসারের সাম্‌নে রমা এসে কোমর বেঁধে না দাঁড়ালে পবিত্র চৌধুরি সত্যিই পাগল হ'য়ে যেতেন। আত্মীয়-বন্ধুরা তাই যখন তাঁকে একরকম জোর কোরেই ফিল্মের ব্যবসায়ে নামালো, রমা বিশেষ-কিছু বোললে না। ফিল্ম্ কোম্পানীর নাম শুনে একবার তার নাকটা একটু সঙ্কুচিত হয়েছিলো বটে কিন্তু বাবার জবুথবু ভাব দেখে আর বিন্দুমাত্র বাধা দিলো না। পবিত্র চৌধুরি সেই থেকে আবার কাজের চাকায় জড়িয়ে পড়েছেন। আর রমা একা সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে সংসারের মাঝখানে।

হলদে দুপুর

রাত বারোটা বাজে। রমা আর স্থির থাকে কি কোরে! ঠাকুর-চাকর ঘুমিয়ে পড়েছে—অনেক চীৎকার কোরেও তাদের ঘুম ভাঙাতে পারলো না। সে তখন নিজেই গিয়ে ফোন্ ধরলো।

স্টুডিয়ো থেকে দু'ঘণ্টা আগে বেরিয়ে তিনি কোথায় গেছেন তা' কেউই বোলতে পারে না। আশ্চর্য্য, এত রাত্রে কোথায় যেতে পারেন! কোথায়, কোথায়,—রমা ভাবতে লাগলো। কোথাও যাওয়ার থাকলে আগেই ত তিনি তার কাছে বলেন! পথে কোনো বিপদ হ'ল নাকি! বিপদের কথা ভেবে রমা অস্থির উদ্বেগে অত্যন্ত ব্যাকুল হ'য়ে পড়লো।

সাম্‌নের এই ফাল্গুনে পঞ্চান্ন পেরিয়ে পবিত্র চৌধুরি ছাপ্পান্ন বছরে পড়বেন। এই বুড়ো বয়েসেও তাঁর কেবল কাজ আর কাজ। আগের চাইতে আজকাল কাজে আরও বেশি আগ্রহ। রমা জানে, এই কাজের মধ্যে গভীর ডুব্ দিয়েই তিনি স্ত্রীর কথা ভুলে থাকতে চান।

এইবার রমা নিজের কাছেই হার মানলো। দুর্ব্বল শরীরকে কোনোমতে আর দাঁড় করিয়ে রাখতে পারছে না। বিছানার উপর এলিয়ে পড়ে' সুধু তাদের মোটরের হর্ণ-এর প্রতীক্ষা কোরতে লাগলো। সে ঘুমিয়ে পড়লে তার বাবা বাড়ী এসে হয়তো কিছু না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়বেন। রমাকে জেগে থাকতেই হবে।

আরও খানিক রাত্রি হয়েছে। পবিত্র চৌধুরি তখনও বাড়ী ফেরেন নি। শেষপর্য্যন্ত মা-র কথা ভাবতে-ভাবতেই রমা ঘুমিয়ে প'ল।

পরের দিন সকাল।

দ্বাদশীর স্নানের জন্য গঙ্গায় যাবে বলে' রমা তার বাবাকে ডাকতে গেল।

পবিত্র চৌধুরি তখনও গভীর ঘুমে মগ্ন। শেষরাত্রে শুয়েছেন বলে' রমা তাঁকে জাগালো না। ঝি-টা এখনও আসে নি। অগত্যা, একাই তা'কে গঙ্গা-স্নানে যেতে হবে। রমা তাদের অনেক দিনের পুরোনো ড্রাইভার রতনকে গ্যারেজ্ থেকে গাড়ী বা'র কোরতে বোললে।

…গঙ্গা-স্নান কোরে ফিরবার পথে সে ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস্ কোরলে,—বাবা কাল কখোন্ ফিরলেন রতন?

রতন জবাব দিলো,—রাত দুটোর কাছাকাছি।

—অতো রাত হ'ল কেন?

সাম্‌নে একখানা রিক্‌সা এসে পড়ায় রতন স্টিয়ারিং নিয়ে অতিমাত্রায় সচকিত হ'য়ে উঠলো। কথাটা তার কানে ঢুকলো না। রমা-ও চুপ কোরে গেল।

হলদে দুপুর

ট্রাম্‌-লাইন পার হ'য়ে গাড়ী বাড়ীর দিকে ছুট্‌ছে। কাপড় গুছিয়ে নিয়ে একটু সোজা হ'য়ে ব'সতেই রমার চোখের উপর কি-একটা ঝল্‌সে উঠলো। পায়ের দিকে একটু ঝুঁকে চাইতেই দেখতে পে'ল ফ্লোর-বোর্ড-এর এক কোণে একটা জড়োয়া দুল্‌ পড়ে' আছে। দুল্‌টা হাতে তুলে নিতেই তার বুকের মধ্যে ধক্‌ কোরে উঠলো—মুখটা ফ্যাকাসে হ'য়ে গেল: এ-গাড়িতে দুল্‌ কোত্থেকে এল! এ দুল্‌ কা'র, কোত্থেকে এল এখানে!

রমার বিস্ময়ের আর সীমা নেই।

কিছুক্ষণ চুপ কোরে থেকে সে আবার ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস্‌ কোরলো,—রতন, স্টুডিয়ো থেকে বাবা কাল কোথায় গিয়েছিলেন?

একটু নরম স্বরে রতন উত্তর দিলো,—শ্যামবাজারে।

—শ্যামবাজারে! শ্যামবাজারে কোথায়?

—রাস্তার নামটা ত আমি জানিনে দিদিমণি।

একটু থেমে রমা আবার প্রশ্ন কোরলো,—গাড়িতে কি কাল আর কেউ উঠেছিলো রতন?

—হ্যাঁ,—রতন একটা ঢোক্‌ গিলে বোল্‌লে,—যিনি উঠেছিলেন আমি ত তাঁকে চিনিনে।

রতনকে আর-কিছু জিজ্ঞেস্‌ করা ভালো দেখায় না। এতদিনের পুরোনো ড্রাইভার—তাদের সংসারের কুটোগাছটিতে

হল্‌দে দুপুর

আগুন লাগছে দেখলে সে কী নিশ্চিন্ত থাকতে পারে! রতনকে কী আজ নতুন কোরে চিনতে হবে!

কিন্তু, পৃথিবীর মুখের রঙ্‌ কখন বদ্‌লে যায় কে বোলতে পারে!

কাল রাত থেকে রমা কিছুতেই প্রকৃতিস্থ হ'তে পারছে না, মা-র কথা ভাবতে-ভাবতে হয়তো পাগল হ'য়ে যাবে। আর, সত্যিই সে যদি পাগল হ'য়ে যায়, কে আর তখন বাবা-র ভালো-মন্দ নিয়ে বিচার কোরতে ব'সবে।

গাড়ী প্রায় বাড়ীর কাছে এসে গেছে। রমার মনে সেই একই প্রশ্ন বার-বার মাথা তুলছে: এ-গাড়িতে ফুল্‌ কোত্থেকে এল, এ ফুল্‌ কা'র! কী যে সন্দেহ কোরবে সে বুঝে পে'ল না। মাঝখান থেকে গঙ্গা-স্নানের শুচিতাটুকুই নষ্ট হ'ল। কে জানে, এ-গাড়িতে কে ব'সেছিলো কাল!

বাল-বিধবা হ'লেও আচার-নিষ্ঠায় রমার অসীম আস্থা। দ্বাদশীর সকালে গঙ্গা-স্নান না কোরে জলস্পর্শ করে না। চরিত্রের দৃঢ়তা থেকে এতটুকু বিচ্যুতি ঘটলে মনে-মনে সে আঁত্‌কে ওঠে: এই বুঝি মৃত্যু হ'ল!

বাড়ী এসে কলের জলে আবার সে স্নান কোরলো বেশ কোরে। তবু তৃপ্তি নেই মনে। নানান্‌ দুশ্চিন্তায় উপবাসের পর কেমন যেন একটা বমি-বমি ভাব। ঠাকুর খাবার গুছিয়ে

দিলে তা' থেকে দু'-একটা ফল ও একটু মিষ্টি মুখে দিয়ে সে নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে প'ল।

অন্যদিন এ-সময় রমাকে দেখা যায় রান্নাঘরে। কুটনো কুটে দিয়ে হয়তো ভাঁড়ার গোছাতে বসে' গেছে, কিম্বা পচা মাছ আনার জন্যে চাকরকে ধম্‌কাচ্ছে। কিম্বা, গরম জল তৈরি হ'য়ে গেলে বাবাকে স্নানের তাগাদা দিচ্ছে।

মন থেকে সমস্ত উদ্বেগ সরিয়ে রেখে সে আজ এম্‌নি সময় ঘুমিয়ে প'ল।

তারপর, ঘুম থেকে উঠে দুপুরে যখন সে খেতে ব'সলো তার কিছু আগেই পবিত্র চৌধুরি স্টুডিয়োতে চলে' গেছেন। আশ্চর্য্য! তা'কে না জানিয়ে কী কোরে তিনি যেতে পারলেন— রমা ভেবে পে'ল না। বাপের ওপর অভিমান কোরে সারাটা দিন সে গুম্‌রোতে লাগলো।

সংসারের সমস্ত হ্যাঙ্গাম চুকে গেলে নিজেকে তার বড়ো শূন্য লাগে। আজ রাত্রে আবার সে সেই ট্রাঙ্ক্‌টা টেনে নিয়ে ব'সলো। আবার সেই চিঠিগুলো বা'র কোরে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে পড়তে লাগলো। সুদূর মেসোপোটিমিয়ায় একজন বাঙালী যুবক কামান আর বন্দুকের সাম্‌নে ভাগ্য অনুসন্ধান কোরছে, আর এই কোলকাতায় একটি বর্ষিয়সী মহিলা তার ফিরে-আসার

হলদে দুপুর

প্রতীক্ষায় নিঃশব্দে দিন গুন্‌ছে—মুহূর্ত্তের জন্য রমার কল্পনায় একটি করুণ ছবি ফুটে উঠলো।…গভীরভাবে সে আর এ-কথা ভাবতে পারে না। তার মা—ছি, ছি,—তার মা-কে নিয়ে…

রাত দশটা বাজে। ক্লকের দিকে তাকিয়ে রমা ব্যস্ত হ'য়ে উঠলো। এখুনি তার বাবা ফিরে আসবেন। তিনি বাড়ী এলে আজ সে নিজেই তাঁকে জিজ্ঞেস্ কোরবে, কাল কে তাদের গাড়িতে উঠেছিলো।

ঘরের মধ্যে-র আবহাওয়া তার আর ভালো লাগছিলো না। সমস্ত কুৎসিত কল্পনা থেকে নিজেকে এখন সরিয়ে নিতে চায়। রমা চায় মুক্তি।

সেই চিঠিগুলো সে কুটি-কুটি কোরে ছিঁড়ে ফেললো। রাস্তায় একটা মোটরের হর্ণ বাজ্‌তেই ছুটে গিয়ে দাঁড়ালো বারান্দায়: পবিত্র চৌধুরি বাড়ী ফিরলেন বোধ হয়!

কোথায় পবিত্র চৌধুরি! এগারোটা বাজ্‌তে যায়, আজও তাঁর অকারণ দেরি! অসহিষ্ণু হ'য়ে রমা আবার বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায় দশ মিনিট, আবার ফিরে আসে ঘরে। কী কোরে এই অস্থিরতাকে শাসন করা যায়!

রমা কাল্‌কের সেই ফেলে-রাখা মোজা-জোড়াটি বুন্‌তে বসে' গেল। দুপুরে না ঘুমুলে এতক্ষণে নিশ্চয়ই শেষ হয়ে যেত এটা।

অনেকগুলো ঘর উলে ভর্ত্তি কোরে সে আবার বাবার কথা

ভাবতে লাগলো। ক্লান্ত মস্তিষ্কে জড়িয়ে যেতে লাগলো একটা অস্পষ্ট ধোঁয়ার কুণ্ডলী। কাল রাত থেকে কেবলই সে রহস্যের পথে-পথে এলোমেলো ঘুরে বেড়াচ্ছে। কাল রাত থেকে তার মা-র স্মৃতিগুলো ক্রমশ বিবর্ণ হ'য়ে আসছে।…নিষ্ঠুর জীবন-ধারণের বাধ্যতায় তার স্বামীর শোকও ক্রমশ নিবে এসেছে। কিন্তু বাবার জন্যে—

বারোটা বাজ্‌লো। রমা আর স্থির থাকতে পারে না। মোজা বোনা ফেলে রেখে স্টুডিয়োতে একটা ফোন্ কোরবার জন্যে পাশের ঘরে গেল। ফোন্‌টা হাতে তুলে ধরে' একমুহূর্ত্ত কী যেন ভাবলো—কাল একবার ফোন্ কোরেছে, আজ আবার সেই একই কারণের জন্যে…না, না, তা' ভালো দেখায় না। সে ফোন্‌টা নামিয়ে রাখলো।

নিজের ঘরে ফিরে এসে রমা কি ভেবে একবার আর্শীর সাম্‌নে দাঁড়ালো। এলো খোঁপাটায় একটা চাপ দিয়ে চুলগুলো পিঠময় ছড়িয়ে দিলো। এই চুলের রাশ নিয়েই হয়েছে তার মুস্কিল। বিধবা-মানুষ, জীবনে যার আর কোনো আকর্ষণ নেই, কী হবে তার এই অনর্থক বোঝা ব'য়ে! আর্শীর সাম্‌নে আর একটু এগিয়ে গিয়ে সে শিউরে উঠলো: ওঃ, এখনো কী রূপ তার! শরীরের প্রত্যেকটি রেখা দিয়ে আজো সেই যৌবনের রক্তিম আগুন ঝরে' পড়ছে!

কিন্তু কী হবে আর এই রূপ দিয়ে! কাঁচি দিয়ে চুলগুলো কাট্‌তে উদ্যত হ'য়ে রমা পাগলের মতো নিজের মনে খানিকটা হাসলো। আর্শীর সাম্‌নে মুখটা আরো একটু উজ্জলভাবে তুলে ধরে' বিড়-বিড় কোরে বক্‌তে লাগলো: রূপ! এ-জগতে রূপই ত সব! নারীর রূপ আর পুরুষের টাকা—তা' না হ'লে আর কিসে সর্ব্বনাশ হবে—কিসে একটা সংসার রসাতলে যাবে।…না, না,—চুলগুলো সে কাটবে না—তার একটা চুলেও এখনো পাক্‌ ধরে নি, সুধু-সুধু চুলগুলো কেটে লাভ কী!

তারপর, মনে-মনে কী উচ্চারণ কোরে সে আবার হাসলো, আর তার চোখের সাম্‌নে ঝল্‌সে উঠলো সেই জড়োয়া দুল্‌টা!

একটা বাজে। পবিত্র চৌধুরি এখনও বাড়ী ফেরেন নি।

ইলেক্‌ট্রিক্‌ আলোর তীক্ষ্ণ তীব্রতায় রমার মাথার মধ্যে সব যেন তালগোল পাকিয়ে গেল। নিজের উপর একটু মমতা হ'ল তার: একটা চুলেও এখনো পাক্‌ ধরে নি। সত্যি, কী হবে চুলগুলো কেটে!

কাঁচিটা মেঝের উপর ছুড়ে ফেলে দিয়ে রমা নিজেকে বিছানার মধ্যে ডুবিয়ে দিলো।

সিঁথিতে অনেক সিঁদুর

একবার, দু'বার, তিনবার—এম্‌নি কোরে অনেক যত্নে ছোটো সিল্‌ভার ষ্টিক্‌খানা দিয়ে বনলতা তার সিঁথিতে অনেক সিঁদূর লাগালো। সোজা ও সুদীর্ঘ তার সিঁথি। সেই সিঁথির অনেকখানি রঞ্জিত কোরলো চীনে সিঁদূর দিয়ে। কিন্তু, তবু যেন কোথায় গোঁজামিল র'য়ে গেল—পরিপাটি হ'ল না।

না, এ হ'ল না,—বনলতা ড্রেসিং-আয়নার আরো নিকটে মুখ এগিয়ে নিয়ে নাকের ডগা সঙ্কুচিত কোরলো,—কিচ্ছু হ'ল না, একেবারে বাজে সিঁদূর!

চীনে সিঁদূর সুধু বাজে নয়, বিশ্রী—ম্যাড়-মেড়ে হাল্‌কা লাল বালি যেন। বনলতা এত যত্নের পরও সিঁথিতে টাট্‌কা রক্তের মতো রঙ্‌ দেখতে না পেয়ে বিরক্ত হ'য়ে উঠলো। দরকার নেই এই সিঁদূরে! আয়নার আরো নিকটে মুখ নিয়ে গিয়ে সিঁথিতে জোরে-জোরে আঁচলের কোণ্‌ ঘষতে লাগলো।

ওদিকে, তপেশের তাগাদা ক্রমশ উচ্চকিত হ'য়ে উঠছে। তপেশ আজ স্ত্রীকে নিয়ে একটা ভালো সিনেমায় যাবে বলে' আগে থেকেই প্রস্তুত হ'য়ে ছিলো। একে আজ তাদের প্রথম বিবাহ-বার্ষিকী, তার উপর বাজে ফিল্মের ভিড় ঠেলে' অনেক দিন বাদে কোলকাতায় একটা ভালো ছবি এসেছে। বাইরের ঘরে দাঁড়িয়ে তপেশ প্রায় অধৈর্য্য হ'য়ে উঠ্‌ছে: দেরি কোরছো কেন আর?

হলদে দুপুর

বনলতা ড্রেসিং-টেব্‌লের ড্রয়ারটা খুলে তন্ন-তন্ন কোরে কী খুঁজতে লাগলো। তাড়াতাড়িতে তার মনে আসছে না— আর একটা সোনার সিঁদুর-কৌটো এই ড্রয়ারের মধ্যেই রেখেছে, না আর কোথাও! সেই ছোট্টো সোনার সিঁদুর-কৌটোটা— মেক্সিকোর দামী ও দুষ্প্রাপ্য সিঁদুর-ভরা কৌটোটা যা' গত বছর তার বিয়ের সময় শ্রীমান্ মুখুয্যে তা'কে উপহার দিয়েছিলো।··· ড্রয়ার খোঁজা শেষ হ'ল—ড্রয়ারে তা' নেই। বনলতা পাশের ঘরে চলে' গেল। সেখানে তার ট্রাঙ্কের প্রসাধন-স্তূপের মধ্যে হাত ডুবিয়ে দিয়ে খুঁজতে লাগলো। শ্রীমানের-দেওয়া দামী ও দুষ্প্রাপ্য মেক্সিকোর সিঁদুর-ভরা কৌটোটা সত্যি কোথায় গেল যে! কি জানি, হারিয়ে গেল নাকি তা'!···যাক্, পাওয়া গেছে, পাওয়া গেছে!

পাত্‌লা আনন্দের উচ্ছলতায় বনলতার শরীরে মৃদু চাঞ্চল্য এল, আর সন্ধিৎসু মন কোথায়, কিসে যেন চাপা প'ল; আর মিহি-সুরে, থেমে-থেমে, এদিকে-সেদিকে ঘুরতে-ফিরতে রবি ঠাকুরের এক লাইন গান নিয়ে দুই ঠোঁটের উপর নাড়াচাড়া কোরতে লাগলো।

আবার ড্রেসিং-আয়নার সাম্‌নে গিয়ে দু' মিনিট মনোযোগ দিয়ে বনলতা চমৎকার কোরে মেক্সিকোর সিঁদুর পরলো। নিঃশব্দ খুসিতে অঙ্গের আবক্ষ প্রসারিত কোরে স্বচ্ছ আয়নায়

প্রতিফলিত নিজেকে দেখতে লাগলো। সত্যি, কী সুন্দর দেখাচ্ছে এখন তা'কে! ঘনকৃষ্ণ রেশ্মী কেশপুঞ্জকে দু' ভাগে চিরে সিঁথির রক্তিম সরল রেখাটি জল্-জল্ কোরছে,—যেন এক টুক্রো কালো ভেল্ভেটের উপর লাল জরির ঝিকিমিকি।

এতক্ষণে তপেশ চুপ কোরলো। এতক্ষণে তার স্ত্রী বনলতা আনুসঙ্গিক সমস্ত প্রসাধন শেষ কোরে আঁচল উড়িয়ে স্বামীর পিছু-পিছু দ্রুত পা ফেলে ট্যাক্সিতে এসে চেপে ব'সলো।

ট্যাক্সি সাদার্ন এভিন্যু থেকে বেরিয়ে রসা রোডের উপর দিয়ে চৌরিঙ্গীর দিকে ছুটছে। তপেশ বনলতার একটু গা' ঘেঁষে বসে' জিজ্ঞেস্ কোরলো: এর আগে তুমি বোধ'য় কোনোদিন নিউ-এম্পায়ারে আসো নি?

রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে বনলতা উত্তর দিলো: আসবো না কেন!

—কিন্তু এই ফিল্মটা, মানে 'ডিজাইন্ ফর্ লিভিং' এর আগে নিশ্চয়ই দ্যাখো নি?

—এর আগে এটা কোলকাতায় আসেই নি বোধ'য়!

—তা' হবে। একটু থেমে তপেশ আবার বোললে: 'ডিজাইন্ ফর্ লিভিং', চমৎকার নামটি, না? শ্রীমান্ থাকলে খুব এন্জয় কোরতে পারতো!

শ্রীমানের নাম উচ্চারিত হ'তেই বনলতা অতিরিক্ত গম্ভীর

হ'য়ে, একটু বিকৃত দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে তাকালো। কিন্তু তা'তে তপেশের দৃষ্টি একটুও নমিত হ'ল না। বরং, তার চোখের তারায় একটি সরল প্রশ্ন প্রতিফলিত হ'ল: শ্রীমানকে আসতে বোললে না কেন?

কণ্ঠস্বরে একটু উত্তাপ ঢেলে দিয়ে বনলতা জবাব দিলো: আমি কি তার বাড়িতে বোলতে যাবো নাকি? বেশ যা হোক্ তুমি!

—কেন, শ্রীমান্ আজ আসে নি?

স্বামী-স্ত্রীর কথাবার্তার মুক্ত গতিতে হোঁচট্ লাগলো, অনাবিল আনন্দ রইলো না আর। তর্কের উগ্র উৎসাহ একটু-একটু কোরে আরো প্রখর হ'য়ে উঠলো তাদের মধ্যে। বনলতা যেন একটু ক্ষুণ্ণ, যেন একটু বিমর্ষ হ'য়েই বোললে: কেন জানো না তুমি, সে রোজ আসে কি না!

ট্যাক্সি নিউ-এম্পায়ারের গাড়ী-বারান্দায় এসে থামতেই তাদের কথা কাটা-কাটির সুতো ছিঁড়ে গেল। ভাড়া চুকিয়ে গাড়ী থেকে নেমে কাউণ্টারে এসে দাঁড়ালো স্বামী-স্ত্রী। নিউ-এম্পায়ারের শান্ত ও শীতল পরিস্থিতিতে পা ছোঁয়াতেই তাদের মনোমালিন্য মুহূর্তে অপসৃত হ'ল।

এক বছর আগে, ঠিক এম্নি একটি সন্ধ্যা তাদের দু'জনের চোখে, দু'জনের মনে মদির হ'য়ে ছিলো। তারা-ভরা তাদের

হল্‌দে দুপুর

সেই বিয়ের রাত ! সেদিন, মনের রঙিন পাত্র ছাপিয়ে আনন্দের সে কী অকৃপণ উচ্ছ্বাস ! সেই সন্ধ্যায়, দু'জনার হৃদয়ের অন্ধকার ঠেলে' একটি নিটোল চাঁদ উঠেছিলো। অস্তোন্মুখ কৌমার্য্যের রক্তিম মেঘ সরিয়ে এসেছিলো একটি বসন্ত-পূর্ণিমার রাত। তা'রা, তপেশ ও বনলতা সেই রাতকে খুঁজতে এসেছে আজ 'ডিজাইন্‌ ফর্‌ লিভিং'-এ ! স্বামী-স্ত্রী নিরুদ্বেগে পর্দ্দার উপর 'ডিজাইন্‌ ফর্‌ লিভিং'-এ হারিয়ে গেল।

বুদ্ধিমতী বনলতা। সে কি শ্রীমানকে একেবারে আল্‌গা কোরে তপেশের হাতে তুলে দিতে পারে। হ্যাঁ, শ্রীমান্‌ এসেছিলো, আজ দুপুরেই। এই ত, দু'ঘণ্টা আগে শ্রীমান্‌ চলে' গেছে,—এখনও, এখনও তার শেষ কথাটির বিষাক্ত আনন্দ বনলতার সমস্ত সত্ত্বাকে দুঃস্বপ্নের মতো জড়িয়ে আছে।

শ্রীমান্‌ মুখুয্যে। সম্প্রতি ভারতবর্ষের একাধিক অভিজাত ইংরিজী পত্রিকার পৃষ্ঠা থেকে শ্রীমান্‌ মুখুয্যের পরিচিতি ও প্রসিদ্ধি কোলকাতার সোসাইটি-চাঁইদের ঠোঁটের উপর ছিট্‌কে পড়ে' উপ্‌চে উঠচে। কিন্তু য়্যামেচার জার্ণালিষ্টদের যথেষ্ট মর্য্যাদা থাকলেও সাধারণের চোখে, বিশেষ কোরে পাত্রী-পিতাদের চোখে সে-মর্য্যাদার কোনোই আর্থিক মূল্য নেই। বেঁকিয়ে না বোললে বোলতে হয়, তা'রা বেকার—মধ্যবিত্ত বাঙালী গৃহস্থের খোঁড়া

বিধবা-মেয়ে। আর শ্রীমান্ মুখুয্যের যা' আর্থিক সঙ্গতি আছে তা' দিয়ে কোলকাতার মোটর-মুখরিত সড়কে সম্পর্দ্ধ রেস্ দেওয়া যায় না—নাম-করা মেয়েদের প্রেম ও যৌবন নিয়ে ছিনি-মিনি খেলা যায় না। তার যা' আছে, তা' হচ্ছে সাহিত্য-জগতের ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার রঙিন্ ইন্দ্রজাল।

তিন বছর আগে তার এই ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার প্রদীপ্ত স্ফুলিঙ্গ ছিট্‌কে এসে লেগেছিলো বনলতা গাঙ্গুলীর গা'য়। তখন, বনলতা গাঙ্গুলীর বয়েস ষোলো, পড়তো ডায়োশেসানে—আর, শ্রীমান্ মুখুয্যের কুড়ি কি একুশ, পড়তো য়ুনিভার্সিটিতে। ফার্ষ্ট ইয়ারের মেয়ে বনলতা একদিন সামান্য কারণে শ্রীমানকে ছোট্টো একটি ধন্যবাদ জানাতে গিয়ে দশটি কথা ব্যয় কোরে ব'সলো। তারপর দু'জনে দেখা হ'ল দশ বার, দশ জায়গায়। বনলতার অভিভাবকবৃন্দের প্রসন্ন নজরে নেমে আসতে শ্রীমানের দেরী হ'ল না। তারপর, তার উপর হুকুম হ'ল বনলতাকে লজিকের ফ্যালাসি হজম করাবার। প্রকাশ্যত, লজিকের ছুতো নিয়ে এইবার দু'জনের আরো ঘনিষ্ঠ হ'বার সুবিধে হ'ল।

তারপর যা' হয়। প্রেমিক ও প্রেমিকার ভূমিকায় শ্রীমান্ ও বনলতা। প্রেম যখন তাদের ক্ষুধার্ত্ত ইন্দ্রিয়ের শিখরকে স্পর্শ কোরেছে, শ্রীমান্ চাইলো বনলতাকে বিয়ে কোরতে।

য়ুনিভার্সিটির কৃতী ছাত্র শ্রীমানের প্রচুর অর্থ না থাকায়

হলদে দুপুর

বনলতার অভিভাবক এ-সম্ভাবনার মূলেই একেবারে কুঠারাঘাত কোরলেন।

বনলতার বিয়ে হ'ল শ্রীমানেরই বন্ধু তপেশের সঙ্গে।

তপেশ মুন্সেফ্। অন্তত আর্থিক সঙ্গতির দিক দিয়েও তার একটা নিটোল ভবিষ্যৎ আছে। অভিভাবক ভেবে দেখলেন, বনলতা নিশ্চয়ই সুখী হবে।

বিয়ের কয়েকদিন আগে শ্রীমান্ করুণ হ'য়ে বনলতার হাত নিজের মুঠোর মধ্যে চেপে ধরলো: তুমি এ-বিয়ে কোরো না বনলতা—বরং, চলো আমরা পালিয়ে যাই!

বনলতা বুদ্ধিমতী। সেদিন সে শ্রীমানের শেষ কথায় সম্মত হ'য়ে তার শক্ত মুঠি থেকে নিজের হাত কৌশলে মুক্ত কোরতে পেরেছিলো।

হ্যাঁ, সেই শেষ কথাটির জবাব নিতেই শ্রীমান্ আজ দুপুরে আবার চুপি-চুপি এসেছিলো: বনলতা, আজ আবার এলাম। কাল কোলকাতা ছেড়ে চলে' যাচ্ছি—তাই শেষবার তোমার কাছে এলাম!

বনলতা সেলাই-এর মেশিনে মনকে বেশি কোরে চেপে দিলো: বাইরে যাচ্ছো?—মুখ তুলে শ্রীমানের বিমর্ষ মুখের দিকে চাইলো: কোথায়?

—রেঙ্গুনে যাচ্ছি। 'রেঙ্গুন টাইমস্' এর জয়েন্ট্ এডিটারি পেয়েছি কিনা!

—সুখী হ'লাম শুনে।…কিছুক্ষণ চুপ কোরে থেকে মেশিনের চাকা ঘুরিয়ে দিয়ে বনলতা বোললে: সত্যি সুখী হ'লাম।

দীর্ঘনিঃশ্বাস চেপে শ্রীমান্ বোললে: সুধু সুখী হ'লে চল্‌বে না, আমার সাথে চলো তুমি—আমার সাথে চলো বনলতা!

বনলতা ঔদাসীন্যের হাসি হেসে জবাব দিলো: এ ত সেই পুরোনো কথা!…একটু থেমে, সে এবার হাসির সাথে অনুযোগ মিশিয়ে জোরে বলে' উঠলো: ছি, ছি,—তোমার ছেলে-মানুষী দিন-দিন বেড়ে উঠ্‌ছে দেখছি!

—তা' ত তুমি বোলবেই।

—না, সত্যি, দিন-দিন তুমি বড়ো অবুঝ হ'য়ে উঠছো!

—এখন সে-কথা না বোললে তুমি আর তপেশের স্ত্রী!

মুখ তুলে বনলতা শ্রীমানের চোখের উপর গম্ভীর দৃষ্টি হেনে' একটু ধমক্ দিলো।

শ্রীমানের কণ্ঠস্বরে স্মৃতিময় ধূসরতা: বনলতা, তুমি কী বোঝো না, আজো আমি তোমাকে কতো ভালোবাসি! চলো, আমার সঙ্গে রেঙ্গুন চলো তুমি!

বনলতা নিজেকে আর ঢেকে রাখতে পারলো না: রোজ বোলছি আমি যাবো না, যাবো না, যাবো না—তবু কেন তুমি আমায় বিরক্ত করো! যাও, বাড়ী যাও,—দিদি পাশের ঘরে শুয়ে আছেন, উনি এঁখুনি বাড়ী ফিরবেন—বাড়ী যাও বোলছি!

—হ্যাঁ যাবো। কিন্তু তুমি এতো নিষ্ঠুর—এতো শিগ্‌গির তোমার প্রতিজ্ঞা ভুলে গেলে বনলতা!

—হ্যাঁ, ভুলে গেলাম,—তোমার পা'য় পড়ি তুমি এখন যাও!

—তোমাকে না নিয়ে কী কোরে যাই! যেতেই হবে তোমাকে বনলতা!

বনলতার ভয় হ'ল। মেশিন ছেড়ে শ্রীমানের দিকে না তাকিযেই তাড়াতাড়ি সে চলে' গেল তার ননদের ঘরে।

নিউ-এম্পায়ার থেকে তপেশ ও বনলতা অনেকক্ষণ হ'ল ফিরেছে, অনেক খুসি নিয়ে। রাত দশটায় খাওয়া-দাওয়া শেষ হ'লে ঘরের সবুজ আলোটি জ্বেলে' রেখে তা'রা দু'জনে শুয়ে প'ল।

নরম, সবুজ আলো বনলতার মসৃণ মুখের উপর অপূর্ব্ব লাবণ্য বিস্তার কোরেছে। তার দিকে তাকালে মনে হয়, বনের ঘন পুষ্পশ্রীর উপর এক ঝাঁক জ্যোৎস্না জ্বল্‌ছে। বালিসের উপর এলো খোঁপাটিকে একটু আল্‌তো কোরে বেঁকিয়ে রেখে বনলতা পাশ ফিরে তপেশের মুখের কাছে এগিয়ে এল: কী সুন্দর রাত, না?

তপেশ তার কথায় সায় দিলো : হ্যাঁ।—একটু থেমে আবার বোললে : দেখতে-দেখতে একটা বছর কেটে গেল। না ?

—তা' গেল বৈকি ! দেখতে-দেখতে এম্‌নি আরোও কতো যাবে !—বনলতার কথা-বলার ভঙ্গিতে একটু ঔদাসীন্য ও একটা অবরুদ্ধ বেদনার ইঙ্গিত।

—আমরাও পুরোনো হ'তে চল্লাম, কি বলো !—তপেশ একটু হেসে বললে।

এবার ঔদাসীন্যের সঙ্গে একটা অনুযোগের সুর বেজে উঠলো বনলতার কণ্ঠস্বরে : হ'তে চ'ল্লাম আর কি, বিয়ের প্রথম থেকেই ত আমি তোমার কাছে পুরোনো হ'য়ে আছি !

স্ত্রীকে বুকের মধ্যে আকর্ষণ কোরে তপেশ একটু আদরের অভিনয় কোরলো : পুরোনো ?

—পুরোনো নয়ত কি !—দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বনলতা আস্তে-আস্তে আবৃত্তির ভঙ্গিতে বোললে : এই এক বছরের ভিতর এক দিনের জন্যেও যদি আমরা—

বুক থেকে স্ত্রীকে একটু সরিয়ে দিয়ে তপেশ দু'জনের মধ্যে সামান্য একটু ব্যবধান রচনা কোরলো, কিন্তু বনলতার তা' সহ্য হ'ল না। এগিয়ে এসে সে দু' হাতে স্বামীর গলা পেঁচিয়ে ধরলো, চুমু খেলো তা'কে : সত্যি কোরে বলো, আমাকে তোমার ভালো লাগে না, না ?

হল্‌দে দুপুর

তপেশ রোমাঞ্চিত হ'ল। স্ত্রীর বুকের উপত্যকায় হাত বুলোতে-বুলোতে জবাব দিলো : এ-কথা কেন বোলছো বনলতা ?

—এ-কথা না বোললে তুমি ত বুঝবে না !—তপেশের বুকের সঙ্কুচিত আশ্রয়ে মাথা গুঁজে দিয়ে বনলতা প্রায় কেঁদে উঠলো : তুমি ত বুঝবে না, আমার সমস্ত আশা, সমস্ত আকাঙ্ক্ষা দিন-দিন কি ভাবে ব্যর্থ হ'য়ে যাচ্ছে ! কী নিষ্ঠুর, কী কঠিন পাষাণ তুমি !

দু' মিনিট দু'জনে চুপ কোরে রইলো। তাদের মনের গুমোট আস্তে-আস্তে ঘরের আবহাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে।

দাম্পত্য-জীবনের বাঁধা-ধরা সিঁড়ি বেয়ে উঠতে-উঠতে আজকে হঠাৎ তা'রা পরস্পরের মুখোমুখি হ'য়ে থম্‌কে দাঁড়ালো। তারা পরস্পরকে আরো সোজাসুজি জানতে চায়। আরো সোজা-সুজি—সন্দেহের কুয়াশাকে ছিঁড়ে ফেলে নেমে আসতে চায় স্থুল সত্যের স্পষ্ট আলোকে। কতোদিন, কতোদিন চলে আর এম্‌নি কোরে।

স্ত্রীকে বুক থেকে নিজের মুখের কাছে সরিয়ে এনে তপেশ বোললে : আচ্ছা, তাহ'লে জিজ্ঞেস্‌ করি একটা কথা ! প্রায়ই শ্রীমান্‌ এখানে আসে—দিদি বোললেন, সে আজো এসেছিলো। কিন্তু তুমি তা'কে আমার কাছে লুকোও কেন বলো ত ?

বিরক্ত হ'য়ে বনলতা উত্তর দিলো : লুকোতে যাবো কেন আমি ! তুমি আমাকে ভুল বুঝেছ। সে তোমারই বন্ধু ! তোমার বাড়িতে আসে কেন, জিজ্ঞেস্‌ কোরো তা'কে।

—কিন্তু তা'কে তুমি লুকোও কেন আমার কাছে ?

—ব'য়ে গেছে আমার লুকোতে ! তার নাম উচ্চারণ কোরতে আমার ঘৃণা হয় !

ঠাট্টার সুরে স্ত্রীর কথাকে বেঁকিয়ে দিলো তপেশ : ঘৃণা হয় ! না আমাকে চুমো খেতে গিয়ে, আমার বুকে বুক মেশাতেই তার চিন্তায় পুড়ে ছাই হ'য়ে যেতে থাকো তুমি !

—ছি, ছি,—স্ত্রীর সম্মান রেখে কথা বলো !

—স্ত্রীর সম্মান !—বিদ্রূপ কোরে তপেশ হো-হো শব্দে হেসে উঠলো : স্ত্রীর সম্মান সোজাসুজি নিতে জানো না যে তুমি !—একটু শান্ত হ'য়ে বনলতার সিঁথির উপর হাত বুলোতে-বুলোতে সে বোললে : বিয়ের আগে শ্রীমানকে যদি ভালোবেসেই থাকো, কিছুই অন্যায় করো নি তা'তে ! কিন্তু এ কি, এক বছর যেতে না যেতেই তুমি তা'কে ঘৃণা কোরে আমার সাধ্বী স্ত্রী সাজতে চাও ! ছি, ছি, বনলতা, তোমার প্রেমে এত ছদ্মবেশ !

—তোমার পা'য় ধরি, তার কথা তুলো না, তা'কে আমি সত্যিই ঘৃণা করি।

—ঘৃণা করো !—দু'বার এই কথাটি আবৃত্তি কোরে তপেশ পুনরায় সশব্দে হেসে উঠলো।

আবার দু' মিনিট স্তব্ধতা। তপেশের সচেতনতা চাপা পড়লো এলোমেলো উত্তেজনায়। অন্যমনস্ক হ'য়ে সে স্ত্রীর সিঁথির

সিঁদুর খুঁটতে লাগলো। বনলতা সিঁথি থেকে তপেশের হাত সরিয়ে দিয়ে বোললে: কী কোরছো! সিঁথির সিঁদুর খুঁটতে নেই!

তপেশের ধ্যান ভাঙলো যেন: কী বোললে, সিঁথির সিঁদুর খুঁটতে নেই? ছদ্মবেশে আঁচড় লাগছে বুঝি?

বনলতার মুখ আরক্ত-গম্ভীর: কেন তুমি আমায় যা-তা অমোন কোরে বোলছো? তুমি কী জানো না, তোমাকে ছাড়া এ-জীবনে আমি আর কাউকে ভাবতে পারি না!

তপেশের ঠোঁটে বাঁকা-হাসি: তা' ত বটেই! কুমারী-জীবনে লুকিয়ে এর-ওর সঙ্গে প্রেম কোরে স্ত্রী হওয়ার পর ওইটুকুই ত ফাল্‌তু আনন্দ!...ওঃ, বিয়ে হবার পর সোনা ও শাড়ীর জন্যে সীতা সাজ্‌বার কী চমৎকার আর্ট তোমাদের!

বনলতা এগিয়ে এল। দু'হাতে জোর কোরে আবার তপেশের গলা জড়িয়ে ধরে' করুণভাবে বোললে: ওগো, কেন তুমি এসব বোলছো আজ? আমাকে তুমি ক্ষমা করো—আমি যে তোমার স্ত্রী!

—হ্যাঁ, তা'তো দেখছি। অনেক সিঁদুর ব্যয় কোরে সিঁথিতেও সে-কথা লিখে রেখেছো।—তপেশ হঠাৎ বিছানার উপর উঠে বসে' স্ত্রীর মাথার উপর ঝুঁকে পড়লো। তারপর জোর কোরে বুড়ো আঙুল দিয়ে ঘষে'-ঘষে' বনলতার সিঁথির সিঁদুর মুছে

দিতে লাগলো: এর আর দরকার নেই বনলতা! আমাকে বিশ্বাস করো,—আমি তোমাকে খেতে-পরতে দেবো, কাছে নিয়ে শোব রাত্রে,—স্ত্রীর এই ছদ্মবেশ ত্যাগ করো তুমি!

সমস্ত শক্তি দিয়ে তপেশকে ঠেলে দিতে চেষ্টা কোরলো বনলতা, কিন্তু পারলো না। স্বামী-স্ত্রীতে রীতিমতো ধ্বস্তাধ্বস্তি সুরু হ'ল। তপেশের নখের ধারে বনলতার কপাল চিরে গেল খানিকটা, চুল ছিঁড়ে গেল কয়েকটা। সে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলো: পা'য় ধরি তোমার, ওগো আমাকে ছাড়ো, ছাড়ো! সিঁথির সিঁদূর মুছো না বোলছি,—সিঁথির সিঁদূর মুছতে নেই।

কাঁদতে লাগলো বনলতা। তা'কে মুক্তি দিয়ে তপেশ তখনও হাসছে: ভয় নেই, এতে তোমার কিছুই হবে না। হ'ত কিছু, যদি শ্রীমান্ কুমারী অবস্থায় তোমাকে 'মা' কোরতে পারতো। আমি হ'লে অন্তত তাই কোরতুম।

বনলতা খাট থেকে লাফিয়ে নেমে ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। যৌবনে এম্‌নি কান্না আছে—কোনোদিন তা'কে এ-কল্পনা কোরতে হয়নি। কোনোদিনও না। মাত্র এক বছর বিয়ে হ'য়েছে তার। প্রথম বিবাহ-বার্ষিকীর রাত্রিতে প্রেমের চুম্বনের বদলে স্বামীর নখের বিষ আশা করে নি। এক বছর যেতে না যেতেই তপেশ তার 'স্ত্রীত্ব'কে প্রত্যাখ্যান কোরছে—আর সান্ত্বনা কোথায় তার,

জীবনে আর কী অবলম্বন, কোথায় আবার নোঙর ফেলবে সে!

ঘরের সেই কোণে দাঁড়িয়ে সে কাঁদতে লাগলো। ঘরের সেই নরম সবুজ আলোয় তার কান্না ও কপালের রক্ত-রেখা স্বামীর চোখের উপর স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো।

তপেশ ঘুরে দাঁড়ালো। আর সে হাসতে পারছে না। নীল হ'য়ে আসছে তার মুখ।

পরের দিন।

খুব ভোরে চাকরকে একটা ট্যাক্সি ডাকতে পাঠিয়ে বনলতা তার ননদের কাছে এসে দাঁড়ালো: গড়পারে যাচ্ছি দিদি, মা-কে দেখতে। মা-র অসুখ! এ-বেলা না-ও ফিরতে পারি!

সাম্‌নের ঘর দিয়ে না গিয়ে বনলতা পাশের গলি ডিঙিয়ে ট্যাক্সিতে এসে উঠলো। সঙ্গে নিলো—কিছু খুচ্‌রো জিনিষে-ঠাসা একটি ছোট্টো এটাচী কেস্‌ মাত্র।

ট্যাক্সি ছুটে চললো। ছুটে চললো গড়িয়াহাট রোড রেখে সার্কুলার রোডে। সার্কুলার রোড থেকে যাবে গড়পারে। কপালে-লুটিয়ে-পড়া চুলগুলিকে সন্তর্পনে সরিয়ে দিতে গিয়ে বনলতা গত রাত্রির স্বামীর সেই নখের আঁচড়টি অনুভব কোরলো।

আর তার সেই অনুভূতিতে কারুণ্য জেগে উঠলো : উঃ, কী নিষ্ঠুর ! কী নিষ্ঠুর এই পুরুষগুলো।

বনলতা মেরুদণ্ড সোজা কোরে গাড়ির গদির উপর সোজা হ'য়ে বসে' ভাবতে লাগলো, কিন্তু এখন উপায় কী ! পুরুষের সাহচর্য্য উপেক্ষা কোরে শুক্‌নো লতার মতো সঙ্কুচিত জীবন-যাত্রা তার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব !

সে ভাবতে লাগলো, এখন উপায় কী ! কী করা যায়, কী করা যায় ! মা-র কাছে গিয়ে কি এই কেলেঙ্কারীর কথা জানানো উচিত ! বলা যায় না, সেখানকার সকলে হয়তো তাকেই দুষ্‌বে। না-না, মা-র কাছে যাওয়া যায় না কিছুতেই ! তবে, তবে কী স্বামীর কাছে ফিরে গিয়ে আবার ক্ষমা চাইবে ! কিন্তু তপেশের অমানুষিক অত্যাচার আর যে সহ্য হয় না। অনেক ভেবে-চিন্তে তার আহত মন মাথা নাড়লো,—না, আর অভিনয়ে দরকার নেই। নিজেকে সে মুক্তি দেবে।

ট্যাক্সি ছুটছে, হঠাৎ সে ড্রাইভারকে বোললে : ডাইনা।

ট্যাক্সি দু'-একটা মোড় ঘুরে পার্ক-সার্কাসের একটা প্রকাণ্ড বাড়ীর সাম্‌নে এসে দাঁড়ালো। বনলতা ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে, একটু শক্ত হ'য়ে সোজা দোতলার ফ্লাটে উঠে এসে কলিং বেল্‌ না টিপেই সুমুখের ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল।

সাতটা বাজেনি তখনো। শ্রীমান্‌ আলমারীর আর্শীর

সাম্‌নে দাঁড়িয়ে গলার টাই বাঁধছিলো। হঠাৎ এম্‌নি সময়ে বনলতাকে এখানে ঢুকতে দেখে সে রীতিমতো চম্‌কে উঠলো : তুমি, তুমি হঠাৎ এখানে !

—কেন, আসতে নেই ?

শ্রীমান্‌ বোকার মতো তার দিকে তাকিয়ে রইলো।

বনলতার ভাব-ভঙ্গিতে যেন একটু অতিরিক্ত স্বাভাবিকতা : ভয়ানক আশ্চর্য্য লাগছে, না ? যাক্‌, আমি তোমার কথা রাখতেই এলাম শ্রীমান্‌ ! চলো, আমি তোমার সঙ্গেই রেঙ্গুন যাবো !

আরো বিস্ময়ে শ্রীমান্‌ তার মুখের দিকে তাকালো রসিকতায় আর লাভ কি ?

—বিশ্বাস করো, রসিকতা কচ্ছিনা। তোমার সঙ্গে যাবো বোলেই চলে' এলাম।

—হঠাৎ তপেশকে ছেড়ে আমার উপর সদয় হ'লে যে ! ব্যাপার কি ?

বনলতা চুপ কোরে রইলো। শ্রীমান্‌ তার কপালের দিকে লক্ষ্য কোরে বোললে : ও কি, কাটলো কোত্থেকে ?

বনলতা মেঝের দিকে মুখ নিচু কোরে জবাব দিলো : কাটে নি। ঘুমের ঘোরে হাতের চুড়িতে আঁচ্‌ড়ে গেছে।…কিন্তু তুমি এত সকালে বেরুচ্ছো যে ! জাহাজ ত প্রায় ন'টায় !

—এখনও খুচ্‌রো কয়েকটা জিনিষ কিনতে বাকী আছে।

মার্কেটের কাজ সেরে একেবারে জাহাজে গিয়ে চেপে ব'সবো। কিন্তু তুমি, তুমি…

বনলতা এগিয়ে গেল শ্রীমানের কাছে: আমি ত তোমার কথাই রাখলুম! তুমি আর আমায় ফিরিয়ো না এখন!

•

মার্কেটে ট্যাক্সি থামিয়ে শ্রীমান্ নিজের বাকী জিনিষগুলো ও বনলতার জন্যে প্রয়োজনীয় কয়েকটা কাপড়-চোপড় কিনলো।

তারপর তা'রা এসে জাহাজে উঠলো।

জাহাজ সকাল সাড়ে আটটায় আউটরাম ঘাট ছেড়ে এসে বিকেল পাঁচটায় বে-অব্-বেঙ্গলের মোহানার উঁচু ঢেউয়ের ফণার উপর দুল্‌ছে।

আকাশের ঊর্দ্ধপ্রান্তরে, জল-ছোঁয়া চক্রবালে, সমুদ্রের অদৃশ্য কিনারায় ছাই ছড়িয়ে আছে। অবসন্ন শরীর নিয়ে শ্রীমান্ ও বনলতা কেবিন থেকে বেরিয়ে এসে ডেকের উপর রেলিং ধরে' গা-ঘেঁষাঘেঁষি কোরে দাঁড়ালো।

তাদের চোখের উপরে তাদের অনেক দিনের স্বপ্ন ও কল্পনার সমুদ্র দুল্‌ছে। মাঝে-মাঝে দূর থেকে দু'-একটা ষ্টিমারের কর্কশ হুইস্‌ল আলপিনের মতো তাদের বুকে এসে বিঁধছে; বিশেষ কোরে বনলতার বুকে। তার মুখের স্বাভাবিক দীপ্তিটুকু

নিভে গেছে। এখন সে সমুদ্রের মতোই করুণ ও গম্ভীর। চোখের সাম্‌নে ক্ষ্যাপা ঢেউগুলো যেন তার বুকের পাঁজ্‌রার উপর দিয়ে গর্জ্জন কোরতে-কোরতে গড়িয়ে যাচ্ছে। গুঁড়িয়ে যাচ্ছে তার বুক। তার কল্পনার পিছনে কাঁদছে তপেশ,—সাম্‌নে কাঁপছে রেঙ্গুনের গৃহস্থালীর ছবি। মাঝখানে স্বধু শ্রীমান্‌ ছুঁয়ে আছে। বনলতা কথায়-কথায় শ্রীমানের হাত ধরে' জিজ্ঞেস্‌ কোরলো: আচ্ছা, রেঙ্গুনে গিয়ে আমার কি পরিচয় দেবে?

শ্রীমান্‌ বোললে: হঠাৎ এ-কথা মনে এলো কেন?

—এম্‌নি। বলো না কি পরিচয় দেবে?

—পরিচয় দেবো যে তুমি আমার উপস্ত্রী।

—উপস্ত্রী! না-না, তুমি আমাকে বিয়ে করো শ্রীমান্‌! ওকে আর আমি চাই না!

—বিয়ে! বিয়ে কি কোরে আর এখন সম্ভব!···আর, এক বছর আগে হ'লে হয়তো কোরতুম!

—এখনও নিঃসন্দেহে কোরতে পারো। এই এক বছর, বোললে বিশ্বাস কোরবে না, আমি আমার স্বামীকে তার স্বাভাবিক অধিকার থেকেও বঞ্চিত রেখেছিলাম!

—এ আর কঠিন কী? মাত্র ত এক বছর!

বনলতা লজ্জিত হাসি হেসে বোললে: এক বছর যথেষ্ট সময়। এই এক বছরে বাঙালী মেয়েরা দু'বার প্রেগ্‌ন্যাণ্ট্‌

হয়।···বাজে কথা থাক্। তুমি আমাকে বিয়ে কোরবে কি না?

—কী বোলছো বনলতা, বিয়ে? আবার?

—তা' ছাড়া আর উপায় কী! সমাজে ত থাকতে হবে!

—সমাজ! কাচের চাইতে ঠুন্‌কো সমাজের আয়নায় মুখ দেখতে চাও এখনো? স্বামী-স্ত্রীর চাইতেও বড়ো বন্ধনের কল্পনা কোরতে পারো না?

—তা'তে কি সুখী হ'তে পারবো আমরা?

শ্রীমান্ পৌরুষের অভিমানে ফুলে উঠলো: সুখ-দুঃখ আমি বুঝি না। যতদিন ইচ্ছে থাকবে, তোমাকে স্ত্রী না কোরেও আমি তোমার নারীত্বের উপর পূরো অধিকার বজায় রাখবো, পূরো আনন্দে তোমার দেহ ও যৌবন উপভোগ কোরবো, বুঝলে!

চায়ের সময় হ'য়ে এল। শ্রীমান্ সামান্য সান্ত্বনার স্বরে বনলতাকে বোললে: অনেক সময় আছে এ-সব কথা ভাববার। হাত মুখ ধুয়ে এসো এখন। কাপড়টা বদ্‌লে নাও। চায়ের সময় হয়েছে।

বনলতা হাত মুখ ধুয়ে কেবিনের মধ্যে গিয়ে কাপড় বদলালো। তারপর, আজ-সকালে-কেনা হেলিওট্রোপ্ শাড়ীটা পরে' শ্রীমানের মুখোমুখি হ'য়ে চা খেতে ব'সলো। চায়ের কাপে প্রথম চুমুক দিতে গিয়ে শ্রীমান্ বোললে: অনেক দিন পরে তোমার সাথে

হলুদে দুপুর

চায়ের টেব্‌লে বসে' অনেক দিনের কথা মনে পড়ছে! হয়তো ভুলে যাওনি তুমি, শীতের সন্ধ্যেয় কলেজের ছুটির পরে দু'জনে আউটরাম ঘাটের উপরে কতো দিন চা খেতে ব'সেছি। তখন চিম্‌নীর কালো ধোঁয়া আর গঙ্গার কালো জলে আমরা সমুদ্রের স্বপ্ন দেখেছি। মনে পড়ে?

মুখ নিচু কোরে বনলতা উত্তর দিলো: হ্যাঁ।

সে মুখ তুলতে এতক্ষণে শ্রীমান্ দেখলো তার সিঁথিতে সিঁদূর নেই।

—সিঁদূর পরোনি কেন বনলতা?

বনলতা একটু ঠাট্টা কোরলো: বিয়ে কোরতে ভয় পাও—সিঁদূরে ত ভক্তি কম দেখছি না!

—না-না, এখুনি একটু সিঁদূর লাগিয়ে এসো। এটা জাহাজ। এখানে পুলিশের চোখে তুমি আমার স্ত্রী!

বনলতা চায়ের টেব্‌ল থেকে উঠে কেবিনে গিয়ে তার এটাচী খুলে সেই সিঁদূর কৌটোটা বা'র কোরলো।

শ্রীমানের উপহার-দেওয়া সেই সিঁদূর কৌটোটা। অনেক লোভ ছিলো তার এতদিন এই কৌটোটায়। কিন্তু আজ সিঁদূর পরতে গিয়ে কেমন যেন লাগলো। সে পারলো না সিঁদূর পরতে। কৌটোটা মুঠোয় নিয়ে কেবিন থেকে ডেকের একটি নির্জ্জন কোণে এসে দাঁড়ালো।

হলদে দুপুর

ঝাঁপির সাপের মতো হতাশার শ্বাস-প্রশ্বাস তার বুকের নিচু থেকে উপরের দিকে ফুলে-ফুলে উঠতে লাগলো। সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের দিকে তাকিয়ে সে ভাবলো, এবার কোথায় নোঙর ফেলবে? চারিদিকের ধোঁয়াটে শূন্যতায় তার চোখ ঝাপ্‌সা হ'য়ে এল—লোনা হাওয়ায় গা শির-শির কোরে উঠলো।

বে-অব্‌-বেঙ্গলের এই মোহনার জল আজ কালোও নয়, নীলও নয়। নিকটের তিনটি নদী থেকে গেরুয়া ঢল্‌ নেমে আসায় জলের রঙ্‌ লাল্‌চে। আর এই লাল্‌চে জলের উপর অস্তগামী সূর্য্যের সোনা গলে' গলে' যাচ্ছে।···

হঠাৎ জাহাজের করুণ-গম্ভীর হুইস্‌ল শুনে বনলতার হৃদ্‌পিণ্ডে ভীষণ ধাক্কা লাগলো। গ্লানির বিষাক্ত সাপ তার ভয়ার্ত্ত চেতনায় দাঁত ফুটিয়ে দিলো। দুঃখে আর বিতৃষ্ণায় সে সোনার সিঁদুর কৌটোটা ঢেউ-এর উপর ছুড়ে ফেলে দিলো।

প্রথমে, কৌটোটা ঢেউয়ের আছাড়ে একবার লাফিয়ে উঠলো, তারপর সমস্ত সিঁদুর ছড়িয়ে গেল সেই লাল্‌চে জলে।

সমুদ্রের লাল্‌চে জল—তার উপর সূর্য্যের গলিত সোনা—তার উপর টাট্‌কা রক্তের মতো লাল মেক্সিকোর সিঁদুর!···এত লাল বনলতা সহ্য কোরতে পারলো না। দু'হাত দিয়ে সে চোখ ঢাকতে উদ্যত হ'ল, কিন্তু পারলো না—পিছন থেকে এসে আগেই শ্রীমান্‌ তার হাত দু'খানা চেপে ধরেছে।

সিফিলিস

নাঃ, চাঁদ ওঠার এখনও অনেক দেরি—মনে-মনে এই কথা উচ্চারণ কোরে স্বর্য্যেন্দু জান্‌লার নিকট থেকে চেয়ারে এসে ব'সলো। তারপর সুসজ্জিত টেব্‌লের কোণ্‌ থেকে রঙিন্‌ প্যাডখানা হাতের কাছে সরিয়ে এনে ভাবতে লাগলো একমনে। একমনে সে ছুটতে লাগলো এলোমেলো চিন্তাপুঞ্জের ভিড় ঠেলে। একটা দুর্ব্বল আশা তা'কে পিছন থেকে ধাক্কা দিচ্ছে আর একটি সুন্দর শূন্যতা তা'কে উদাস, গভীর কোরে তুলছে।···কিন্তু আকাশে চাঁদ কই!

এইবার সে চাঁদের সিঁড়ি ছুঁতে পারবে। এইবার সে সোনার পাহাড়ের চূড়োয় দাঁড়িয়ে সম্রাট-বিক্রমে ঘোষণা কোরবে, এ ত আমার, চাঁদের এই বিশাল রাজত্ব—এ ত আমার!—স্বর্য্যেন্দু চোখ বুজে সুনীল শূন্যে এক বিরাট সোনালী রাজধানীর কল্পনা কোরলো। তার মুঠোর মধ্যে যেন এক দুর্লভ আলোক-পিণ্ড ঝলসাচ্ছে, তার চোখের তারায় সহস্র শুকতারা নাচছে, আর তার মুখমণ্ডল থেকে অসহ্য লাবণ্য বিচ্ছুরিত হচ্ছে। স্বর্য্যেন্দু আর মাটি ছুঁয়ে নেই—কল্পনায় সে এখন অনেক দূরে—আকাশের প্রান্তর, মহাশূন্য ডিঙিয়ে চলেছে।

কিন্তু সুধু এই কল্পনা নিয়ে স্বর্য্যেন্দু আজ আর কবিতা লিখতে পারছেনা। অথচ, তার তীব্র ইচ্ছে, চাঁদ নিয়ে অতিচমৎকার একটা কবিতা লেখে। অতিচমৎকার একটা কবিতা—যা' তার

প্রতিভার ছাঁচে ঢালাই হ'য়ে ভাবের অভিনবত্বে, ভাষার ইন্দ্রজালে চাঁদের চাইতেও সুন্দর হ'য়ে উঠবে।

চোখ খুলে সে আবার আকাশের দিকে দৃষ্টি ফেরালো, চেয়ারে ভাল কোরে এঁটে ব'সলো, প্যাডের উপর কনুইয়ের ভর দিয়ে ভাবতে লাগলো।…

রাত্রি বারোটা বাজে…

পার্ক-সার্কাসের একটা অভিজাত রাস্তার উপর বেশ ছোট্টো একটি একতলা বাড়ী। এ-বাড়িতে মানুষের মধ্যে সুধু সূর্য্যেন্দু সেন ও তার চাকর। অনেকক্ষণ হ'ল চাকরটা ঘুমিয়ে পড়েছে। আশপাশের বাড়িগুলোতে ক্লান্ত নিস্তব্ধতা। সুধু দূরের রেল-লাইন থেকে মাঝে-মাঝে হুইস্‌ল ও সান্টিং-এর শব্দ আসছে,—দূরের বড়ো-রাস্তা থেকে দু'-একটা ছুটন্ত বাসের শব্দও এই রাত্রির নিস্তব্ধতাকে বিঁধছে। আর, ধোঁয়া ও পাত্‌লা কুয়াশার মধ্যে রাস্তার গ্যাসপোষ্টগুলোর মাথায় বৃত্তাকার ঘোলাটে আলো জড়িয়ে আছে। আর, বাতাস বন্ধ হ'য়ে এখুনি গুমোট্ সুরু হবে মনে হচ্ছে। এম্‌নি আবহাওয়ায় কবি সূর্য্যেন্দু সেন তার বাড়ির একটা ফাঁকা ঘরের মধ্যে নিজেকে বন্দী রেখে কবিতা লেখার চেষ্টা কোরছে।

আশপাশে কেউ কোথাও জেগে নেই। নিদ্রিত নগরীর মুখে

হলদে দুপুর

একটা প্রগাঢ় প্রশান্তি। সূর্যেন্দু আঙুলের মধ্যে কলম চেপে টেব্‌লের উপর মাথা গুঁজে বসে' আছে, আর তার প্রিয় কুকুর জ্যাক্ তার পায়ের উপর গুড়িসুড়ি মেরে তন্দ্রার আলস্য উপভোগ কোরছে।

টেব্‌ল থেকে মাথা তুলে অনেক ভেবে-চিন্তে সূর্যেন্দু দু'লাইন লিখলো। মাত্র দু'লাইন। মাত্র কয়েকটি ফ্যাকাসে শব্দের প্রতিবেশিত্বে অতিসাধারণ দু'টি লাইন। তা'তে না আছে এত-টুকু ছন্দের লালিত্য, না একটা মসৃণ উপমা। কালির পুরু আঁচড় দিয়ে সে সে-দু'লাইন কবিতাকে হত্যা কোরলো, এবং আবার টেব্‌লের উপর ঝুঁকে পড়ে' মনে-মনে মাথা খুঁড়তে লাগলো: চাঁদ নিয়ে তা'কে কবিতা লিখতেই হবে।

ঘরের মধ্যে বিশ্রী গরম। বাতাস বন্ধ হয়েছে বোললেই হয়। সীলিং-ফ্যানের ব্লেডগুলোও নামানো রয়েছে। সূর্যেন্দুর অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ হ'তে লাগলো,—তীব্র ইলেক্‌ট্রিক্ আলোর নিচে অনেকক্ষণ বসে' থেকে মাথা ঝাঁ-ঝাঁ কোরছে। কয়েক মুহূর্ত্ত সে পৃথিবীর সক্রিয় অস্তিত্বকে ভুলে গেছে। কিন্তু তবু তার কল্পনায় বিরতি নেই, অস্পষ্ট চাঁদের পিছু-পিছু অক্লান্ত ছুটছে।

আরো অনেকগুলো মুহূর্ত্ত কেটে গেল। তারপর, দৈবানুগ্রহের মতো হঠাৎ তার মাথায় চারটে লাইন ভিড় কোরে এল। একেবারে আস্ত চারটে লাইন। সূর্যেন্দু তার স্মৃতিশক্তি দিয়ে

সে-লাইনগুলোকে আঁকড়ে ধরলো ও মনোযোগী ছাত্রের মতো সযত্নে মুখস্থ কোরে নিলো।

এতক্ষণে তার মস্তিষ্কের দক্ষিণ-জান্‌লা খুলে গেল। কিশোরী-নায়িকার মনে রেশ্‌মী আবেশ ছুঁইয়ে দিয়ে, কুমারীর দেহে প্রথম যৌবন এনে দিয়ে কোনো প্রেমিক যেমন আনন্দ অনুভব করে তেম্‌নি ভীরু আনন্দে সূর্য্যেন্দু উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলো: যাক্‌, চারটে লাইন মাথায় এসেছে ত—এখন এক গ্লাস জল খেয়ে এসে তাড়াতাড়ি লিখে ফেলি। ওঃ, যা তেষ্টা পেয়েছে!

কুঁজো থেকে জল গড়াতে-গড়াতে সে আবার আকাশের গায়ে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিলো এবং জলের গ্লাসটি মুখে লাগিয়ে জান্‌লার কাছে এসে দাঁড়ালো। আবার তার আকাশের চাঁদের উপর লোভ। একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে বোললে: কী আশ্চর্য্য, এখনও ত চাঁদ উঠলো না!

তারপর তার অন্যমনস্কতা নেমে এলো ধোঁয়া ও কুয়াশা-জড়ানো রাস্তার অস্পষ্ট আলোর উপর, সেখান থেকে ঘরের ভিতরকার কুকুরের উপর। তন্দ্রাচ্ছন্ন জাক্‌কে একটু আদর কোরে সে চেয়ারে এসে ব'সলো। তারপর প্যাডের একটা নতুন পাতায় কলম ছুঁইয়ে নিজের মনে বোললে: লেখা সুরু করি ত এখন—তারপর সুরু হ'লে শেষ না হ'য়ে আর যায় না।

নিশীথ রাত্রি—সে লিখতে সুরু কোরলো,—ধূসর নিশীথ

হলদে দুপুর

রাত্রি, আকাশে চাঁদ নেই ; চাঁদের বিরহে রাত্রি ক্রমশ শীর্ণ ও পাণ্ডুর হ'য়ে আসছে,—চাঁদের বিরহে কবি তার হারানো-প্রিয়াকে খুঁজে পাচ্ছে না।—এম্‌নি দু'লাইন লেখার পর কলম থেমে গেল। বাকী দু'লাইন আর মাথায় আসছে না। কলম চিবিয়ে, মাথার চুল ছিঁড়েও বাকী দু'লাইন স্মরণ কোরতে পারছে না।

অসহ্য গুমোটে ও লাইটের তীব্র উত্তাপে সূর্য্যেন্দু হাঁপিয়ে উঠলো। চেয়ার ছেড়ে ঘরের মধ্যে পায়চারী কোরতে-কোরতে খুঁজতে লাগলো হারিয়ে-যাওয়া লাইন দু'টো। সমস্ত স্মৃতিশক্তি নিংড়ে দিয়ে খুঁজতে লাগলো সেই চমৎকার লাইন দু'টো। কিন্তু কোথায় আর সেই চাঁদের রাজত্ব, আর কোথায় বা সেই সোনার পাহাড়! পা পিছ্‌লে সে অন্ধকার পাতালে তলিয়ে গেছে।

শেষপর্য্যন্ত সে হতাশায় ভেঙে পড়লো টেব্‌লের উপর। ভীষণ মাথা ধরলো তার। রক্তের নদীতে তপ্ত ঢেউ ফুলে-ফুলে উঠতে লাগলো। আর, কিছুক্ষণ বাদে তার তলপেটের তলদেশ থেকে সামান্য জ্বালা আস্তে-আস্তে সর্ব্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। সূর্য্যেন্দু দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁট চেপে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে শিউরে উঠলো : সর্ব্বনাশ!

সর্ব্বনাশ! আবার বুঝি তার সিফিলিসের জ্বালা সুরু হ'ল। আবার সেই প্রাণান্তকর যন্ত্রণা তা'কে আক্রমণ কোরছে।···একটা আর্ত্তনাদ তার কণ্ঠনালীতে এসে আটকে গেল।

হলুদে দুপুর

অনেকদিন বাদে আজ আবার সেই যন্ত্রণার সূচনা হ'তেই সূর্য্যেন্দু অনুভব কোরলো, কে যেন তার ব্রহ্মরন্ধ্রে সজোরে একটা পেরেক্ পুতে দিচ্ছে, আর এক দল পিঁপড়ে যেন সেই ক্ষতস্থানে ক্রমাগত কামড়াচ্ছে।

এক মুহূর্ত্তে তার মেজাজ বদ্‌লে গেল। · নিজেকে সে মনে-মনে তিরস্কার কোরতে লাগলো : ছি-ছি-ছি, সুধু নিজের দোষেই ত এম্‌নি হ'ল। এই ভ্যাপ্‌সা গরমে ইলেক্‌ট্রিক্ আলোর নিচে রাত জেগে বসে' থাকলে কঠিন নতুন রোগই ত হয় মানুষের! ছি-ছি-ছি, আমার বুদ্ধির কী শোচনীয় অধঃপতন হয়েছে নিজের স্বাস্থ্যকে পর্য্যন্ত আমি বাঁচিয়ে রাখতে জানি না! চরিত্রে শৃঙ্খলা নেই, কোনো ইচ্ছার পিছুতে যুক্তি বা বিবেচনা নেই— অধঃপতনের আর কী বাকী আমার!

ক্রমশ নিম্ন অঙ্গের সেই ভয়ঙ্কর জ্বালা দাবানলের উগ্রতা নিয়ে তার শরীর ও মনকে পুড়িয়ে খাক্ কোরে দিচ্ছে। কে যেন ছুঁচলো নখ দিয়ে তার মাথার শিরা-উপশিরাগুলিকে ছিঁড়ে-খুঁড়ে দিচ্ছে আর হৃদ্‌পিণ্ডের উপর সাঙ্ঘাতিকভাবে ঘুসি চালাচ্ছে।

এই মুমূর্ষু অবস্থাতেও সে মাঝে-মাঝে রচিত লাইন দু'টির উপর করুণ অসহায়ভাবে তাকাচ্ছিলো। আর দেখছিলো, আকাশে চাঁদ উঠলো কিনা।

এখনও চাঁদ ওঠেনি। কঠিন সহিষ্ণুতা নিয়ে সে নিজের

জীবনকে ভাবতে লাগলো। ভাবপ্রবণ জীবনের অর্থহীন, উত্তুঙ্গ আদর্শ এবং মূঢ় শারীরিক প্রয়োজনের পরস্পর সংঘর্ষ ও সঙ্ঘাতে তার সংযমের রাশ ছিঁড়ে গিয়েছিলো—তাই আজো তার ফলভোগ কোরতে হচ্ছে। তাই, জীবনের ফলে কামড় দিয়ে বিষাক্ত আস্বাদ ছাড়া সে আজ আর কিছুই পায় না।

সহিষ্ণুতার সীমা ছাড়িয়ে জ্বালা ক্রমশ আরোও বেড়ে যাচ্ছে। সূর্য্যেন্দু বিগত জীবনের ভুলের জন্য অনুশোচনা স্থগিত রেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লো। তারপর, এই ভীষণ যন্ত্রণা থেকে সাময়িক নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যে একটু ঠাণ্ডা জলের সাথে একেবারে দু'-দুটো ট্যাব্‌লেট গিলে ফেললে, এবং আলোটা নিবিয়ে দিয়ে খাটের উপর হতাশ হ'য়ে শুয়ে পড়লো।

একেবারে নির্জ্জন ঘর। কোনো দ্বিতীয় ব্যক্তির সান্ত্বনা বা শুশ্রূষা না থাকায় ছটফটানির ভিতর থেকে তার মর্ম্মস্পর্শী অস্ফুট আর্ত্তনাদ ঘর থেকে বাইরের কুয়াশা-কুণ্ডলীতে জড়িয়ে যাচ্ছে। অসহ্য যন্ত্রণায় অনেকক্ষণ হাত-পা ছোড়াছুড়ির পর সে ক্লান্ত হ'য়ে পড়লো—আর সেই ক্লান্তি ধীরে-ধীরে তার চোখে আনলো ঘুম।

গির্জ্জের ঘড়িতে দেড়টা বাজলো।

এতক্ষণে চাঁদও উঠলো আকাশে। আর সেই চাঁদের নরম আলোয় সূর্য্যেন্দুর ঘর ভরে' উঠতে লাগলো। আর সেই চাঁদের

হল্‌দে দুপুর

রশ্মি তীরের মতো এসে চোখে বিঁধতেই জ্যাকের তন্দ্রা ছিঁড়ে গেল। ঘরের শুভ্র দেয়াল, আলোকিত মেঝে ও আসবাবপত্রের ছায়ার দিকে তাকিয়ে জ্যাক্ গেল থতমত খেয়ে। তারপর, চামরের মতো ছোট্ট ল্যাজটি দুলোতে-দুলোতে টেব্‌লের নিচে থেকে বেরিয়ে এসে চীৎকার কোরতে সুরু কোরলো। আর সেই চীৎকার মধ্যরাত্রির কঠিন নিস্তব্ধতাকে টুক্‌রো-টুক্‌রো কোরে ফেললে। সূর্য্যেন্দুর ঘুম ভেঙে গেল।

পূরো এক ঘণ্টাও সে শুতে পায় নি। দেহের উত্তাপ কমে' গিয়ে, জ্বালাটা বন্ধ হ'য়ে সবেমাত্র ঘুমটা ঘন হয়ে আসছিলো— ইতিমধ্যে কুকুরটার অনবরত চীৎকারে সব ছিন্নভিন্ন হ'য়ে গেল।

খাট থেকে নেমে এসে আলো জ্বেলে জ্যাকের পিঠে হাত বুলোতে-বুলোতে সে ঘরের এদিকে-ওদিকে দেখতে লাগলো। কই, কোথাও ত কিছু নেই! কুকুরটা চেঁচাচ্ছিলো কেন— কিছুতেই সে বুঝতে পারলো না। জ্যাক্ তার হাতের আদর পেয়ে দিব্যি আরামে চোখ বুজে ল্যাজ নাড়তে লাগলো।

বিশ্রী গুমোট্ একেবারে বন্ধ না হ'লেও জান্‌লা দিয়ে মাঝে-মাঝে দু'-এক ঝলক্ হাওয়া আসছে। ঘরের পিছনের হাস্নুহানার ঝাড়ে মাঝে-মাঝে দোল্ লাগছে। সূর্য্যেন্দু জান্‌লার নিকটে এসে দাঁড়িয়ে দেখলো, হাস্নুহানার ডালে পুঞ্জ-পুঞ্জ জোনাকি ঝুল্‌ছে,— আর সেই জোনাকির ঝাঁক জ্বল্‌ছে আর নিব্‌ছে। পথের পাণ্ডুর

হল্‌দে দুপুর

আলো ও ধূমল কুয়াশা দৃষ্টিকে আগের মতো আর বাধা দিচ্ছে না। সূর্য্যেন্দু আকাশের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত কোরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললে: ওঃ, এতক্ষণে চাঁদ উঠেছে!

কাঁচা ঘুম থেকে উঠে আসায় তার মাথা ধরেছে। শরীরে ও মনে সেই ম্যাজ্‌ম্যাজানি; তার ভয় হচ্ছে, আবার হয়তো সেই জ্বালা সুরু হবে।

একটু ঠাণ্ডা নির্জ্জনতার আশায় আলো নিবিয়ে দিয়ে সূর্য্যেন্দু বারান্দায় এসে একটা ইজিচেয়ারে ব'সলো; বসে' বিমর্ষ হ'য়ে নিজের জীবনকে ভাবতে লাগলো।

সূর্য্যেন্দু সেনের পরিচয় খুবই সংক্ষিপ্ত। তার তিরিশ বছরের ক্ষয়িষ্ণু যৌবনে শীর্ণ স্রোত থাকলেও কোনো বন্ধন নেই। মেঘচুম্বী কল্পনা ও রূঢ় বাস্তবতায় মিলে-মিশে তার জীবন অসংখ্য গোঁজামিলে ভর্ত্তি।

ইচ্ছে কোরেই সে মা ও দাদার নিকট থেকে দূরে থাকে। নিজেকে সে সুধু নিজের হাতে ছেড়ে দিয়েই নিশ্চিন্ত। সংসারে তার স্নেহ, মমতা ও ভালোবাসার একমাত্র পাত্র হচ্ছে জ্যাক্‌। সুন্দর, ছোট্টো এই কুকুরটি না থাকলে হয়তো, এতদিন কোপ্‌নি এঁটে সন্ন্যাসী হ'ত, না হয় কোরতো আত্মহত্যা।

হল্‌দে দুপুর

বড়ো-রাস্তার উপর দিয়ে দৈত্যের মতো দাপাদাপি শব্দ কোরে একটা লরী চলে' গেল। কিন্তু সূর্য্যেন্দুর ভাবনায় কোনো আঘাত লাগলো না। নিজেকে সে কখনো শাসন কোরছে, কখনো দিচ্ছে ধিক্কার। কখনো বা মনের চোখোচোখি হ'য়ে মুখ বিকৃত কোরে উচ্চারণ কোরছে: কী লজ্জাকর এই জীবন! নিয়তির কী মর্ম্মান্তিক বিদ্রূপ এই জীবনে! চাঁদ নিয়ে কবিতা লেখার জন্যে এতক্ষণ আমি মাথা খুঁড়েছি। ছি-ছি-ছি, এই আমার আধুনিক জীবন! এই আমার সংস্কার-মুক্তি! মনে-মনে সে অট্টহাসি হাসলো: চাঁদ! চাঁদ নিয়ে কবিতা! আকাশের সোনা ছুঁতে লোভ! বেশ মজার জীবন যাহোক্!

চাঁদ ক্রমশ উজ্জ্বল হচ্ছে। আকাশ থেকে সূর্য্যেন্দুর ঘর অবধি যেন একটি ছোটোখাটো পূর্ণিমার স্বপ্নজাল ছড়িয়ে আছে। কুয়াশা পাত্‌লা হ'য়ে গেছে। ঝির্‌ঝিরে বাতাসে হাস্নুহেনার নরম আতর। আকাশ কাচের মতো স্বচ্ছ ও নির্মলিন। মনে হয়, চাঁদের অজস্র রুপুলি আলো এই ছোট্টো বাড়িটিকে এখুনি ধুয়ে দিয়ে যাবে।

সূর্য্যেন্দুর আত্মা কেঁপে উঠলো। তার চিন্তারাশি হোঁচট্ খেলো। আবার সেই যন্ত্রণা তার শিরায়-শিরায় সঞ্চারিত হচ্ছে। তার নিঃশ্বাস-গ্রহণের পথে কে যেন একখানা বলিষ্ঠ হাত চাপা দিচ্ছে।

ওদিকে, ঘরের মধ্যে জ্যাক্ পুনরায় চীৎকার সুরু কোরেছে। চীৎকার কোরছে আর মাঝে-মাঝে লাফ-ঝাঁপ দিচ্ছে। বোধ হয়, কিছু দেখে সে ভয় পেয়েছে।

বিরক্ত হ'য়ে সূর্য্যেন্দু ঘরের মধ্যে ফিরে গেল। তারপর, জ্যাক্‌কে কোলে তুলে নিয়ে মুখে হাত চাপা দিয়ে বার-বার বোলতে লাগলো : চুপ্—চুপ্! চুপ্ কর্ বোলছি!

জ্যাক্ টেব্‌লের নিচে গিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়লো।

সূর্য্যেন্দু বারান্দায় ফিরে এসে আবার ভাবতে লাগলো। তার বিরক্তির তিক্ততা তীব্রতর হ'ল, আর শরীরের প্রতিটি রেখায় যন্ত্রণার অসহিষ্ণু ভাষা আরো নগ্নভাবে পরিস্ফুট হ'তে লাগলো : ওঃ, কী ঘৃণ্য আমি! একদিন সেবা-যত্নের অভাবে পচে' গলে' ধ্বংস হ'য়ে যাবো, অথচ, কী অভিনয়ই না কোরছি। ভদ্র-সমাজে আমার উঁচু স্থান! সকলে আমাকে শ্রদ্ধা করে, আমার খ্যাতির সম্মান দেয়। কাল যখন আমি এই বিযাক্ত রোগ গোপন কোরে বেশ ধোপ-দুরস্ত জামা-কাপড় পরে', ক্লীন-সেপড্ মুখে দামী স্নো মেখে সোসাইটিতে গিয়ে মিশবো, তখন আমাকে সন্দেহ করার কী কারুর ক্ষমতা থাকবে! আবার নিজেকে ধিক্কার দিয়ে সে মুখ বিকৃত কোরলো : ওঃ, কী ভীষণ প্রতারক আমি! সভ্যতার কী ভীষণ শত্রু আমি! নিজেকে বিদ্রূপ কোরে সে উচ্চারণ কোরলে : আবার চাঁদ নিয়ে কবিতা লেখার বাসনা আমার!

হলদে দুপুর

আমি আবার উগ্র আধুনিক ! ধিক্ আমার আধুনিকতায় ! এই বিষাক্ত রোগকে সাহিত্য-সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করার সাহস নেই আমার ! সে এবার অপেক্ষাকৃত একটু কম উত্তেজিত হ'ল, নিজেকে সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গিতে আস্তে-আস্তে বোললে : অথচ, সভ্যতার এই দান থেকে দুঃসাহসিক সাহিত্য সৃষ্টি কোরে আমি চরম কীর্ত্তি লাভ কোরতে পারি ! কিন্তু আমার সে সাহস কোথায় ! হায়, আমি স্বধু চাঁদের দিকেই হাত বাড়াই !

জ্যাক্ আবার ভীষণ চীৎকার কোরছে ও দেয়াল আঁচড়াচ্ছে। সূর্য্যেন্দু রেগে ছুটে এল ঘরের মধ্যে—জ্যাকের গালে দিলো সজোরে এক চড় বসিয়ে : চুপ্—চুপ্, মেরে ফেলবো ফের চেঁচাবি ত !

চড় খেয়ে জ্যাকের চীৎকার দ্বিগুণ বেড়ে গেল। সূর্য্যেন্দুও গেল ক্ষেপে : মেরেই ফেলবো তোকে। অসহ্য জ্বালায়, রাগে, বিরক্তিতে রীতিমতো বিভ্রান্ত হ'য়ে সে জ্যাকের গলার বগ্‌লস্ চেপে ধরলো। তার মাথায় খুন চেপেছে, জ্যাক্‌কে মেরেই ফেলবে। মেঝের উপর কুকুরটাকে পা দিয়ে চেপে ধরে' বগ্‌লসটা ঘস্-ঘস্ কোরে খানিকটা কষে' দিলো। তার তিক্ত মনের কোণে এখন কারো জন্য এতটুকুও মমতা নেই। রক্তচক্ষু হ'য়ে, ঠোঁটে ঠোঁট চেপে' সে বগ্‌লসের হুক্‌টাকে আরো দু'টি ফুটো পার কোরে নিয়ে গেল। জ্যাকের জড়িত কান্না ক্রমশ থেমে আসছে, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসও রুদ্ধপ্রায়।

হলদে দুপুর

সূর্য্যেন্দু নির্ম্মম, নিষ্ঠুর দৃঢ়তায় হুক্‌টিকে আরো একটা ফুটোর উপর দিয়ে টেনে নিয়ে গেল।

জ্যাকের মুখ থেকে আর একটিও অস্পষ্ট শব্দ শোনা গেল না। তার ক্ষুদ্র, অসহায় শরীরটা কাঁপছে, তার বিস্ফারিত চোখে দু' ফোঁটা অশ্রু টল্‌টল্ কোরছে।—হুক্‌টাকে আর এক বিন্দু এগিয়ে দিলে জ্যাকের মৃত্যু অনিবার্য্য।

সূর্য্যেন্দু এক মুহূর্ত্ত কি ভেবে, বগ্‌লসটা একটু ঢিল দিয়ে যেই তার মুখের দিকে তাকাতে যাবে অম্‌নি জ্যাক্ দেয়ালের দিকে তেড়ে লাফিয়ে উঠলো ও গোঙ্‌রাতে লাগলো। দৃষ্টি ঘুরিয়ে সূর্য্যেন্দু দেখলো, দেয়ালের গা'য় হেনার ডালের একটা সরু, লম্বা ছায়া সাপের মতো এঁকেবেঁকে দুল্‌ছে।

জ্যাকের গলার বগ্‌লস খুলে দিয়ে সে হতবুদ্ধিতে কিছুক্ষণ নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো। একটা নির্ব্বোধ, নিরীহ জন্তুর উপর বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হ'য়ে সে নিজের বিবেকের সুমুখে হত্যার আসামী হ'য়ে দাঁড়াতে প্রস্তুত হয়েছিলো। কী আশ্চর্য্য, দেয়ালের এই সর্পিল ছায়াটি একবারও তার নজরে পড়েনি।

চাঁদের উদ্ধত আলো এবং সুগন্ধ বাতাস ঘরের মধ্যে লুটো-পুটি খাচ্ছে। আর, কুকুরটা দেয়ালের সেই ছায়ার দিকে তাকিয়ে এখনও চীৎকার কোরছে।

জান্‌লাটা বন্ধ কোরে দিয়ে সূর্য্যেন্দু জ্যাক্‌কে বুকে তুলে নিয়ে

কয়েকটা চুমু খেলো। তারপর, টেব্‌লের নিচে তা'কে শুইয়ে দিয়ে নিজে এসে খাটের উপর লুটিয়ে প'ল। কে যেন এখনও তার ঘায়ের উপর অনবরত স্ঁচ্‌ ফুটিয়ে দিচ্ছে। হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হ'য়ে পরমুহূর্ত্তে হয়তো মারা যাবে, কিন্তু এখনও সে সমস্ত ব্যর্থতার বিরুদ্ধে সংগ্রামমুখী হ'য়ে দাঁড়াতে চায়।

ঘায়ের যন্ত্রণা ক্রমে চরমে উঠছে আর তার গলায় কি যেন আট্‌কে যাচ্ছে। উন্মাদের মতো সে তার কোমরের কাপড়টা মেঝের উপর ছুড়ে ফেলে দিয়ে ছটফট কোরতে লাগলো। একটা করুণ আর্ত্তনাদ তার ঠোঁটের সীমা অতিক্রম কোরে আসতে চায় কিন্তু সে উপুড় হ'য়ে বালিসের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে দিয়ে তা'কে চাপা দিলো। তার বুকের মধ্যে কয়েকটা দুর্ব্বল ঢেউ ফুলে-ফুলে উঠছে —সে মৃত্যু চায় না, কিছুতেই মরবে না; যে-কোনো উপায়ে হোক্‌, বাঁচতেই হবে তা'কে। জীবনের যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকের মতো বুক উঁচু কোরে দাঁড়াতে হবে। এই ঘৃণ্য ব্যাধির নিষ্ঠুর কবল থেকে মুক্তি না পেলে সভ্যতার লজ্জাকর পরাজয়! স্বর্য্যেন্দুর সমস্ত সত্ত্বা নিঙ্‌ড়ে একটা ক্ষীণ কাত্‌রানি বেরিয়ে এল: না-না, আমি মৃত্যু চাই না, যে-কোনো উপায়ে আমাকে বাঁচতেই হবে! রাতটুকু শেষ হ'য়ে গেলেই সব চাইতে বড়ো ডাক্তারের কাছে ছুটে যাবো।

হল্‌দে দুপুর

"তারপর, একদিন রাত্রে আমি যখন লেপ গা'য় দিয়ে শুয়ে পড়েছি সে এসে আমার কানের কাছে মুখ রেখে ফিস্-ফিস্ কোরে বোললে,—বুঝলে সুচারু,—সে এসে বোললে, 'ঘুমিয়ে প'ড়ো না, মা-কে চাবিটা দিয়ে এক্ষুনি আসছি। রাত বারোটার আগে আর মা রান্নাঘর থেকে নিচে নামছে না আজ। ঘুমিয়ো না কিন্তু, এক্ষুনি আসছি'—বোলে সে মহাখুসিতে আমার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

"...শীতের রাত। খেয়ে-দেয়ে একখানা বই মুখে দিয়ে খাটের উপরে দিব্যি আরামে শুয়েছিলাম। দূরে গির্জের ঘড়িতে ঢং-ঢং কোরে দশটা বাজলো। ঘুমের আঠায় চোখ এঁটে আসছে, কোনোরকমে আলোটা নিবিয়ে দিয়ে যেই এসে শুইছি মুড়ি-সুড়ি দিয়ে, অম্‌নি সে এসে চুপি-চুপি এই কথা বোললে। মহাখুসিতে আমিও লাফিয়ে উঠলাম মনে-মনে। আবার, মনে-মনে এ-ও বোলতে লাগলুম, ওর মা যদি জানতে পারে! ভয় হ'ল একটু। চোখ থেকে ঘুম মুছে গেল। লেপটা ফের মাথা অবধি টেনে ওর ফিরে-আসার অপেক্ষায় কান খাড়া কোরে বিছানার উপর পড়ে' রইলাম।

"মিনিট তিনেক বাদেই ইনা পা টিপে-টিপে সত্যি-সত্যি আমার কাছে এল—এসে আমার বুকের উপর ঝুঁকে পড়ে' বোললে, 'সরো একটু, তোমার কাছে বসি।' তখন, আনন্দে আর

ভয়ে আমার গায়ের লোম একটার-পর-একটা খাড়া হ'য়ে উঠেছে। তারপর, একমুহূর্ত্তে কোনোকিছু না ভেবে তার মাথাটা আমার বুকের মধ্যে টেনে এনে আদর কোরে ডাকলুম, 'ইনা—'। উত্তর না দিয়ে সে আমার কাছে আরো সরে' এল। দু'জনের কা'রো মুখ দিয়ে আর কোনো কথা না বেরুনো পর্য্যন্ত ক্রমে সে আমার কাছে আরোও সরে' আসতে লাগলো। ভীষণ মুস্কিলে প'লাম! ভারতে লাগলুম, কী করি! কী করি!

"সে কিন্তু ততক্ষণে আমার গায়ের উপর এলিয়ে পড়ে' নিশ্চিন্ত। তার খোঁপাটা ভেঙে পড়েছে আমার মুখের উপর, আর ডান হাতখানা আস্তে আমার কাঁধটা ছুঁয়ে আছে।

"কী করি, তা'কে ছাড়তেও মায়া হচ্ছে অথচ রাখতেও পারি না আমার কাছে। মহামুস্কিল! রেশমের মতো নরম চুলগুলো নাড়তে-নাড়তে অতিকষ্টে বোললুম, 'সে কী, এখন এখানে ব'সবে কি কোরে! দরজা খোলা রয়েছে, লাইট নিবুনো, তার উপর মাসিমা যদি এখুনি এসে পড়েন!'

"সে আমার মুখে হাত চাপা দিয়ে বোললে, 'আস্তে,—মাকে বোলে এলাম যে আমি ঘুমুতে যাচ্ছি,—আর, মা এখন নিচে নামছেও না শিগ্‌গির।'

"তার এই কথায় আমি কিন্তু একটুও সাহস পেলাম না। তবু, সেই অবস্থার মধ্যেও একটু আবদারের স্বর টেনে তা'কে

বোললুম, 'তোমার মুখ দেখতে পাচ্ছি না, মুখটা দেখতে না পেলে বড়ো বিশ্রী লাগে আমার! আলোটা জ্বেলে দি', কী বলো ইনা?'—'না জ্বেলো না,' সে বোললে, 'আলো জ্বাললে আমি পালাবো কিন্তু।'

"ঠিক এম্‌নি সময়, তিনতলা থেকে দোতলায় নামবার সিঁড়িতে কা'র পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। অম্‌নি বুকের মধ্যে ধক্ কোরে উঠলো। ইনাকে ঠেলে দিয়ে বোললুম, 'এই, শিগ্‌গির পালাও, মাসিমা আসছেন।'

"ইনা কোনোরকমে আমার ঘরের উত্তর দিকের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে, আর তার মা তাদের শোয়ার ঘরে তা'কে না দেখতে পেয়ে উঁচু-গলায় ডাকছেন: ইনা, ইনা, ও ইনা—! আর আমি ততক্ষণে পা-থেকে-মাথা-অবধি লেপ মুড়ি' দিয়ে দম বন্ধ কোরে মড়ার মতো নিজের বিছানায় পড়ে' আছি।···ভেবে দেখ সুচারু, তখন আমার আর ইনার কী সাঙ্ঘাতিক অবস্থা!"

অনেকক্ষণ পরে সুচারু আবার মুখ খুললো, "সাঙ্ঘাতিক—মানে, ইনা সমস্ত লাঞ্ছনা ঘাড় হেঁট কোরে সহ্য কোরলো, আর তুমি চোখ-কান বুজে নিদারুণ অপমান বেমালুম হজম কোরলে। এই ত?"

"না সুচারু, তা' নয়। পরদিন ইনার কাছে শুনলুম—তার মা কোনো সন্দেহই করেন নি। মেয়েকে স্বধু জিজ্ঞেস্ কোরে-

ছিলেন, 'কানের মাথা খেয়ে রাত-দুপুরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে কী হচ্ছিল!' মেয়ে এর উত্তরে কি বোলেছিলো জানো? শুনলে অবাক্ হ'য়ে যাবে—আকাশের দিকে তাকিয়ে ইনা বোলেছিলো, 'একটা উড়ন্ত ফানুস্ জ্বলে' গিয়ে মাটিতে পড়ছিলো—তাই দেখছিলুম মা।'—ব্যস্, তা' নিয়ে আর কোনো উচ্চবাচ্য হয়নি।"

সুচারু বিস্মিত হ'ল, "বলো কি অরুণ, এত সহজে—"

"হ্যাঁ, এত সহজে। কারণ,—ওর মা আমাকে এত বিশ্বাস কোরতেন, এত ভালোবাসতেন যে সেখানে কোনো সন্দেহের ছায়া পর্য্যন্ত এগুতে পারতো না। আর কেনই বা সন্দেহ কোরবেন বলো,—তাঁর ঘরের লোকের মতোই অনেকদিন ধরে' সেখানে আছি—তাঁর ছেলে-মেয়েকে ভাই-বোনের মতো দেখি, যত্ন করি—তাঁ'কে শ্রদ্ধা করি ও মাসিমা বোলে ডাকি।

"যাক্, তারপর"—একটু থেমে অরুণ চাকরকে দু' পেয়ালা চায়ের হুকুম কোরে আবার বোলতে সুরু কোরলো, "তারপর, আমরা সাবধান হ'লুম। কয়েকদিনের জন্য রীতিমতো সাবধান হ'লুম। মানে, ইনা বেশ বুদ্ধির সঙ্গে তার মা-র মন জুগিয়ে চল্‌তে লাগলো। যেমন ধরো, বিকেলে তার মা হয়তো কোনো দূর-সম্পর্কীয় দেওর, কি নিজের ছোটো ভাই, কি পাশের বাড়ীর গিন্নির সঙ্গে গল্প কোরতে ব'সেছেন—সে সেই ফাঁকে সংসারের কিছু খুচ্‌রো কাজ সেরে রাখ্‌লো। মা-র হয়তো একটু মাথা

ধ'রেছে, স্কুল কামাই কোরে সে গিয়ে ঢুক্‌লো রান্নাঘরে ; কিংবা সহানুভূতি দেখিয়ে একাদশীর দিন তাঁ'কে আর বিছানা থেকে নামতেই দিলো না। এই রকম নানান্‌ কায়দায় সে বরং উল্‌টে তার মা-র উপরেই নজর রাখলো।"

একটু থেমে, ঘাড়টা বাঁ দিকে একটু হেলিয়ে দিয়ে অরুণ আবার বোলে চললো, "আর, আমিও একটু বদ্‌লে গেলুম, বুঝলে সুচারু। বদ্‌লে গেলুম, অর্থাৎ কিনা, তাঁর ছেলে ও মেয়ের ভালো-হওয়া নিয়ে, ভবিষ্যৎ নিয়ে বেশি মাত্রায় মাথা ঘামাতে লাগলুম। তাঁর স্ত্রী-পুত্রহীন বুড়ো ভাসুরকে বিশ্রাম দিয়ে নিজেই হয়তো চাকর সঙ্গে নিয়ে একদিন বেরিয়ে পড়লুম বাজারে। খেতে বসে' সপ্তাহের মধ্যে পাঁচবার হয়তো তাঁ'কে বোললুম, 'মাসিমা, আজকাল শরীরের উপর বড্ডো অত্যাচার কোরছেন আপনি— একটা ঠাকুর রাখা যাক্‌ বরং—নইলে, আবার শয্যাশায়ী হ'লেন বলে'।'

"আমরা দু'জনে মিলে এম্‌নি একটি সরল, স্বচ্ছন্দ ভাব বজায় রেখে চলতে লাগলুম। অর্থাৎ, সতর্ক হ'য়ে চলতে লাগলুম। সংসারের সব কাজই বিনা বাধায় বেশ গড়িয়ে চলতে লাগলো। ইনার বুড়ো জ্যাঠা ম'শায় সকাল-বিকেল বেড়াতে যান আর বাজার-হাটের তদারক করেন,—দুপুরবেলা তাঁর একতলার ঘরটিতে নিরিবিলি নিয়মিত খবরের কাগজ প'ড়েন ও ঘুমোন্‌।

ইনার মা সংসারের উপর আল্গা নজর রেখে ঝি-চাকরকে আস্কারা দেন, কখনো বা ধমকান্। ছেলে ও মেয়েকে অকারণে অত্যন্ত আদর কোরছেন হয়তো এখন, খানিক পরে দেখ, বিরক্ত হ'য়ে সামান্য কারণেই আবার তাদের পিট্তে স্বরু কোরেছেন। দুপুর থেকে সন্ধ্যে অবধি মাসিক-পত্রিকার পাতায় ডুবে রইলেন, —নয়তো, দূরসম্পর্কীয় দেওর, কি আর কোনো আত্মীয়, কি পাশের বাড়ীর কোনো মেয়ে বেড়াতে এসেছে, কাজকর্ম্ম ভুলে তাদের সঙ্গে নানান্ গল্পে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিলেন। এম্নি আড্ডা ত লেগেই আছে,—আর আছে সারাদিন ধরে' চা। মানে, পয়সা-কড়ির ভাব্না না থাকলে সাধারণত যা' হয়। মোটের উপর, তুমি ধরে' নিতে পারো যে বিশৃঙ্খলার মধ্যেও সংসারে তখন শান্তি আছে।"

স্বচারু বন্ধুর দিকে তাকিয়ে অনাবশ্যক মুখ টিপে একটু হাসলো, "স্বধু তোমাদের মনেই যা শান্তির অভাব, কি বলো?"

"তা' তুমি বোলতে পারো।"—এতক্ষণে অরুণের গলার স্বর একটু ভারী মনে হচ্ছে। "তবে, এরকম অভিনয়ের ভিতর থেকেও আমরা মাঝে-মাঝে সময় কোরে পরস্পর দেখা কোরতুম, গল্প কোরতুম। শোনো,—একদিন ও জিওমেট্রির একটা এক্সট্রা বুঝে নিতে এল আমার কাছে। এদিক্-ওদিক্ দেখে, এক্সট্রার বদলে পনেরো মিনিট ধরে' আমি তা'কে বুঝোলাম, 'ইনা, আর

তো এম্‌নি কোরে পারি না। আমি যে তোমাকে সর্ব্বক্ষণ সম্পূর্ণরূপে পেতে চাই।' কোনোদিন সকালে চা দিতে এসে সুবিধে মতো আমার কাপে কিংবা আমার ঠোঁটে একটা চুমু রেখে গেল হয়তো।

"চায়ের কাপে চুমুর কথা শুনে তুমি হাসছো সুচারু! কিন্তু তখন তা' ছাড়া কী-ই বা উপায় ছিলো আর! অবাধ্য, চঞ্চল মন তা'তেই শান্ত হ'ত।

"·· একদিন সন্ধ্যেবেলা,—শোনো সুচারু,—একদিন সন্ধ্যেবেলা দোতলায় ওর মা ও আরো কে-কে গল্পে মেতে আছেন—ঠিক সেই ফাঁকে আমি গেলাম একটু তিনতলায়—ছাদে বেড়াতে। ছাদে গিয়ে দেখলুম,—মন দিয়ে শোনো সুচারু, এখুনি চা আসছে,—ছাদে গিয়ে দেখলুম, ইনা এক কোণে আল্‌সের উপর ডান হাতের কনুই রেখে গালে হাত দিয়ে কি যেন ভাবছে গম্ভীরভাবে। প্রথমে, ও আমাকে দেখেও দেখলো না। অভিমানে আমি আর-এক কোণে গিয়ে অন্যদিকে আনমনে তাকিয়ে রইলুম। কয়েক মিনিট কেটে গেল। একবার একটু আড়-চোখে তাকিয়ে দেখি, ও আমার দিকেই করুণভাবে তাকিয়ে আছে।

"ও আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকলো। কাছে গেলে বোললে, 'অরুদা, অনেকগুলো কথা আছে। খুব দরকারী কথা।' আমি বোললুম"—অরুণ মুখ নিচু কোরে একটা চাপা দীর্ঘনিঃশ্বাস

ছাড়লো,—"অনেকগুলো কথা শুনবার সময় ও সুযোগ কোথায় বলো ইনা?' উত্তরে, সে এদিক্-ওদিক্ তাকিয়ে আস্তে-আস্তে বোললে, 'জানি, তোমার কাছে আর তেমন যেতে পারি না বলে' তুমি আমার উপর অভিমান কোরে আছো। কিন্তু শোনো, অনেকগুলো দরকারী কথা আছে। আমি কি ঠিক কোরেছি জানো? কাল শনিবার, দু'টোয় ছুটি—কিন্তু মা-কে কি বোলবো জানো? বোলবো, 'প্রাইজ-ডে'-র জন্যে কাল থেকে রিসাইটেশ্যন্ সুরু হবে মা। আর তাই জন্যে, আমার বাড়ী ফিরতে সাতটা বাজ্তেও পারে। এখন, তুমি কি কোরবে বলো তো?'—মেয়েদের কী বুদ্ধি আর কী দুঃসাহস হ'তে পারে ভেবে দেখ সুচারু, '—তুমি তোমার অফিস থেকে ছুটি নিয়ে দেড়টার সময় স্কুলের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে থাকবে। বুঝলে! তারপর দু'জনে বোটানিক্যাল গার্ডেনে গিয়ে প্রাণখুলে গল্প কোরবো। অবিশ্যি-অবিশ্যি দেড়টার সময় স্কুলের গেটের কাছে থেকো। ভুলো না কিন্তু, বুঝলে!'

"ওঃ, সুচারু, একটা পনেরো বছরের মেয়ের মাথায় এত—" চাকর চা নিয়ে ঘরে ঢুকতেই অরুণ তার জিভ্ সংযত কোরলো।

এই সময় চা আর চুরুটের বিশেষ কোরেই দরকার ছিলো যেন। এমন রোমাঞ্চকর প্রেম-কাহিনী একটানা বোলে যেতে অরুণের নিজের কাছেই শেষপর্য্যন্ত একঘেয়ে লাগছিলো।

হল্‌দে দুপুর

শ্রাবণের একটি নরম, ভিজে সকাল। ঘরের মধ্যে বিষণ্ণ, আনমনা আবহাওয়া। বাইরে, থেকে-থেকে ঝুর্-ঝুর্ কোরে সরু বৃষ্টির রেখা নামছে। নিকটে, মাঠের একটা গাছে অজস্র হল্‌দে ফুল ধরে' আছে, আর তার ভিজে মৌ-এর লোভে ঝাঁকে-ঝাঁকে মৌমাছি অবিশ্রান্ত গুন্-গুন্ কোরে ফিরছে। মোটের উপর, একটি কবিতামণ্ডিত নিটোল সকাল।

ঘরের মধ্যে কৌচে আরাম কোরে বসে' অরুণ তার বন্ধু সুচারুকে বিগত-জীবনের প্রেম-কাহিনী শোনাচ্ছে। সেই কখোন্ থেকে সুরু হয়েছে কাহিনী—এখনো তা' অক্লান্ত গতিতে চলছে ত চলছেই।

এইবার নিয়ে তিনবার চা-খাওয়া হ'ল তাদের। সুচারু ধূমায়িত কাপে একটা চুমুক্ দিয়ে জিজ্ঞেস্ কোরলে, "বোটানিক্যাল গার্ডেনে গিয়েছিলে?"

"গিয়েছিলাম বৈকি!"—অরুণের গলায় সামান্য উদাসীনতা —"গিয়ে দু'জনার কথাবার্ত্তার সার-বস্তু দাঁড়ালো এই যে, এম্‌নি কোরে লুকোচুরিতে আর পারা যায় না। হয় তার মা-র কাছে লজ্জার মাথা খেয়ে বিয়ের জন্য অনুরোধ কোরতে হবে, নতুবা আত্মহত্যা ছাড়া আর উপায় নেই। সত্যি সুচারু, সে-সময় সে আমাকে কী ভালোই না বাসতো! আর, আমিও তা'কে দু'দণ্ড না দেখতে পেলে বুক ফেটে মরে' যেতাম যেন!"

অরুণের কথা বলার ভঙ্গিতে চাপা আর্ত্তনাদ। চুরুটে ঘন-ঘন টান দিয়ে সে বোলতে লাগলো, "তারপর, তা' নিয়ে একটু অভিনয়ও করা গেল। ইনা বোটানিক্যাল গার্ডেন থেকে সাড়ে ছ'টায় বাড়ী ফিরে এসে তার মা-কে একটা কবিতা শুনোতে লাগলো বার-বার কোরে—যেন একদিনের রিহার্সেলেই সে বেষ্ট্ রিসাইটারের প্রাইজটি পাবে। আর, আমি রাত দশটায় বাড়ী ফিরে তার মা-র কাছে গিয়ে ব'সলুম, 'রোমিও-জুলিয়েট ফিল্মটা, ওঃ, কী সুন্দর হয়েছে মাসিমা! নর্মাশিয়ারারের প্লে, ওঃ, জীবনে ভুলবো না! প্রেম ব্যর্থ হ'লে, গায়ের রক্ত কী কোরে চোখের জল হ'য়ে ঝর্‌তে থাকে,—কতো হতাশ হ'য়ে, কতো দুঃখে মানুষ আত্মহত্যা করে—একবার গিয়ে দেখে আসুন মাসিমা!'

"তারপর, সুচারু, নিঃসঙ্কোচে আমরা প্রেম নিয়ে আলোচনা কোরতে লাগলুম। আজকালকার ছেলে-মেয়েদের অবাধ-প্রেমের কথা উঠলো। পালিয়ে-যাওয়া, আত্মহত্যার কথা উঠলো। কথায়-কথায় তিনি একবার বোললেন, 'আমিও ভেবে রেখেছি অরুণ, মেয়ে আমার বড়ো হয়েছে, সে যদি কাউকে ভালোবেসে বিয়ে কোরতে চায় আমি তা'কে একটুও বাধা দেবো না।'

"কথাটা শুনে সেদিন্ স্বর্গের স্বপ্ন দেখেছিলাম, বুঝলে সুচারু। কিন্তু—" অরুণ চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমুক

দিয়ে বোললে, "কিন্তু তারপর, আমার জীবনে যে-নাটক সুরু হ'ল"—চুরুটে একটা লম্বা টান দিয়ে চাপা-গলায় সে বোললে, "তুমি তা' শুনলে কানে আঙুল দেবে। হ্যাঁ, যে শুনবে সে-ই কানে আঙুল দেবে।"

সুচারু তার মুখের দিকে চাইলো গভীর বিস্ময় নিয়ে, আর সে হাতের নখ খুঁট্‌তে-খুঁট্‌তে নিচু-মুখে বোললে, "নাটক আর কিছুই নয়, ইনার মা-কে একদিন দুপুরে আমার বিছানায় শুয়ে থাকতে দেখে একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলাম।

"এখন ব্যাপার হয়েছে কী,—একদিন শনিবার দুপুরে আমি ঘণ্টাখানেক আগেই অফিস থেকে বাড়ী ফিরেছি—ঘরে ঢুকে দেখি, আমার খাটের উপর লেপ গা'য় দিয়ে মাসিমা অর্থাৎ ইনার মা ঘুমিয়ে আছেন। মেঝের উপর আমার জুতোর শব্দ পেয়েই তিনি ধড়মড় কোরে জেগে উঠলেন, 'ও, অরুণ! তুমি এসেছো—' চোখ মুছে তিনি খাট থেকে নেমে আসছিলেন। 'নামছেন কেন মাসিমা, শুয়ে থাকুন না'—তাঁর চোখের দিকে চেয়ে আমি বোললুম।

"বিছানার উপরেই বসে' রইলেন তিনি—এলিয়ে-পড়া চুলগুলো একটা এলোখোঁপায় জড়িয়ে রেখে বোললেন, 'খেটে-খুটে এলে অফিস থেকে, তুমি এসে ব'সো অরুণ—আমি বরং ও-ঘরে যাই।'

হলদে দুপুর

"বাধা দিয়ে আমি বোললুম, 'না, না—বস্থন না মাসিমা, ব্যস্ত হচ্ছেন কেন!'

"তিনি আর ও-ঘরে গেলেন না,—বুঝলে স্থচারু,—কোল্-হাঁটুতে বেশ কোরে লেপটা জড়িয়ে নিয়ে আমার সাথে গল্প স্থরু কোরে দিলেন। আমিও লেপের একটা কোণ্ টেনে হাঁটু অবধি ঢাকা দিয়ে ব'সলুম সেখানে।

"ইনা ও তার ভাই স্কুল থেকে ফেরেনি তখনো। ঝি কাজে আসেনি। নিচের ঘরে ওঁর ভাস্থর নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছেন। চাকরটাও কোথায় যেন গিয়েছে। মোট কথা, বাড়ীর কোথাও কা'রো কোনো সাড়া-শব্দ নেই।

"ঠিক এম্নি সময় আমরা দু'জনে বসে' গল্প কোরছি। গল্পের কোনো মাথা-মুণ্ডু নেই। কথায়-কথায় মাসিমা একবার জিজ্ঞেস্ কোরলেন, 'হ্যাঁ অরুণ, শনিবার হ'লেও তুমি আজ সকাল-সকাল ফিরেছো, না?' আমি উত্তর দিলুম, 'হ্যাঁ মাসিমা। এক ঘণ্টা আগেই পালিয়ে এসেছি।—কেন পালিয়ে এসেছি জানেন? দম্‌দম্ এরোড্রোমে যাবো এখন—মেয়েদের ফ্লাইং কম্পিটিশুন্ দেখতে। যাবেন মাসিমা?'

"স্থচারু, বিশ্বাস করো, যিনি ঘরের কোণ্ থেকে বড়ো কোথাও নড়েন না, তিনি আমার এক কথায় উঠে দাঁড়ালেন। যাওয়ার আগে ঝি-কে ডেকে বোললেন, 'আমি একটু বেরুচ্ছি

পান্নুর মা,—তোমার দিদিমণি ও দাদাবাবু এখুনি স্কুল থেকে আসবে —এই পয়সা রাখো, ওরা এলে খাবার এনে দিও। আর বোলো, সন্ধ্যের আগেই আমি ফিরবো।'

"বাড়ী থেকে বেরুচ্ছি আমরা—এম্‌নি সময় ইনা স্কুল থেকে ফিরে এল। সে-ও আমাদের সাথে যাবে বলে' নাকি-সুরে বায়না ধরলো। কিন্তু তার মা তা'কে নানান্‌ কথায় নিরস্ত কোরলেন—এরোড্রোমে বেড়াতে যাচ্ছেন না-বোলে বোললেন, 'ডাক্তারকে চোখ দেখিয়ে এক্ষুনি ফিরবো।'

"ট্যাক্সিতে উঠে মাসিমা আমাকে তাঁর পাশেই ব'সতে ইঙ্গিত কোরলেন। ব'সলুম এক ধার ঘেঁষে।

"ট্যাক্সি স্টার্ট দিতেই আমি মাসিমার অগোচরে পিছন ফিরে একবার তাকালুম। তাকিয়ে কি দেখলুম জানো? দেখলুম: আমার ঘরের উত্তর দিকের বারান্দায় ইনা মুখ অন্ধকার কোরে দাঁড়িয়ে আছে।…

"এরোড্রোম্‌ থেকে ফিরছি। কথায়-কথায় মাসিমা হেসে বোললেন, 'সত্যি অরুণ, আজকালকার মেয়েদের দেখে আমার বড়ো হিংসে হয়! আজীবন আমরা ম'লুম হাঁড়ি-হেঁসেল ঠেলে' —আর এরা কেমন পরীর মতো পাখ্‌না মেলে আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে।' মাসিমার কথাটা উপভোগ কোরে আমি একটু হাসলুম,—হেসে বোললুম, 'আচ্ছা মাসিমা, আসছে বছর থেকে

ইনাকে পাইলটিং শিখুলে কেমন হয়?' আমার কথার উত্তরে, ভুরু কুঁচ্‌কে মাসিমা বোললেন, 'হ্যাঁ, যা' বোলেছো, ওই শরীর নিয়ে ইনা শিখবে আবার পাইলটিং! রাত্রে একটু জান্‌লা খুলে শুলে যা'র টন্‌সিল্ ফুলে ওঠে তার হাড়ে আর ও-সব না! তোমার কাছেই যা-কিছু ওর মুখেন মারিতং জগৎ।'

"মাসিমার মনোভাবটা স্পষ্ট কোরে বুঝতে পারলুম না। তবে লক্ষ্য কোরলুম, নিজের ব্যাপারে আজকাল তাঁর অসীম উৎসাহ! ভেবে পাই না, কী কোরে মাসিমা এ ক'দিনের মধ্যে এত চট্‌পটে হ'য়ে উঠলেন।

"আর একদিন দুপুর বেলা"—অরুণ আর একটা চুরুট ধরিয়ে চাকরকে আবার চায়ের হুকুম কোরে বোলতে লাগলো, "আর একদিন দুপুর বেলা ঘরে ঢুকে দেখলুম: ওর মা আমার খাটের উপর বসে' আমার একটা পাঞ্জাবির ভাঙা বোতাম বদ্‌লে নতুন বোতাম পরিয়ে দিচ্ছেন। আমাকে দেখেই আগ্রহ কোরে ডাকলেন, 'এসো, ব'সো অরুণ।'

"ব'সলুম সেখানে।...পাঞ্জাবিটা শেষ হ'য়ে গেলে, আমার গায়ের জামাটার দিকে তাকিয়ে দেখলেন সেটাতে বোতামগুলো ঠিক আছে কিনা।...

"তারপর, এ-কথা সে-কথা—'তুমি বড়ো আল্‌সে হ'য়ে যাচ্ছো অরুণ, বড়ো বাজে খরচা কোরছো আজকাল! কী দরকার

ছিলো ইনাকে ওই দামী কলম কিনে দেওয়ার,—ঘন-ঘন ওদের নিয়ে সিনেমায় গিয়ে পয়সার শ্রাদ্ধ কোরেই বা লাভ কী! আমি বোলছি অরুণ, কখনো তুমি হাতে পয়সা রাখতে পারবে না—কখ্‌খনো পারবে না।' এগিয়ে এসে আমার ডান হাতটা তাঁর হাতে তুলে নিয়ে গম্ভীরভাবে বোললেন, 'দেখি তোমার হাতখানা!'

"পামিস্টের মতো খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে আমার হাতের চেটোতে আঙুল বুলিয়ে রেখা বিচার কোরতে ব'সলেন। ঘরের মধ্যে তৃতীয় মানুষ নেই—পানের রসে ঠোঁট লাল কোরে, চুল এলিয়ে দিয়ে, গা ঘেঁষে বসে' তিনি আমার হাত নিয়ে নাড়াচাড়া কোরছেন—আমার কিন্তু কেমন লাগছিলো সুচারু!"

সুচারু গা' ঝাড়া দিয়ে সোজা হ'য়ে ব'সলো। রোমাঞ্চিত বিস্ময় ও কৌতূহলে তার কপালের শিরাগুলো কুঁচ্‌কে আসছে। আর অরুণ ক্রমশ উদাসীন হ'য়ে উঠছে। তার কথা-বলার স্রোতে আর সে আবেগ নেই, আর সে ঔজ্জ্বল্য নেই।

"তারপর, রাত্রে রান্নাঘর থেকে খেয়ে নিচে আসছি, মাসিমা বোললেন,—'অরুণ, আমার একটু কাজ বাকি আছে এখনো, চাকরটা সন্ধ্যে না হ'তেই সরে' পড়েছে—তুমি একটু ব'সো এখানে।'

"ব'সলুম। কিন্তু কই, কোথায় তাঁর কাজ! তিনি তাঁর

মনের অশান্তির কাহিনী বিনিয়ে-বিনিয়ে আমাকে শুনোতে লাগলেন।…

"তারপর,—তারপর আর একদিনের কাণ্ড যদি শোনো—" অরুণের মুখ রাঙা হ'য়ে উঠলো,—"একদিন সন্ধ্যে বেলা মাসিমা এসে বোললেন,'অরুণ, মার্কেটে কয়েকটা জিনিষ কিনতে যাবো, যাবে আমার সঙ্গে ?' আমি রাজী হ'লাম।

"সিঁড়ি দিয়ে নিচে নাম্‌ছি, হঠাৎ মাসিমা আমার কাঁধের উপর একটা ফর্সা র‍্যাপার চাপিয়ে দিয়ে বোললেন, 'এইটা গা'য় জড়িয়ে নাও, তোমার পাঞ্জাবিটা একটু ময়লা।' শান্তশিষ্ট ছেলের মতো সেটা জড়িয়ে নিলুম গা'য়ে।

"মার্কেটে গিয়ে দু'জনের পছন্দ মতো কয়েকটা জিনিষ কেনা হ'ল। বাড়ী ফিরছি—মাসিমা বোললেন, 'শরীরটা কেমন খারাপ লাগছে অরুণ।' গাড়ীর মধ্যে আমার হাতটা টেনে নিয়ে তাঁর কপালে লাগিয়ে দিলেন,—'বড্ডো শীত কোরছে, আর মাথা ধরেছে ভীষণ—দেখো তো, বোধ হয় জ্বর আসছে !'

"বাড়ী এসে তাড়াতাড়ি আমার বিছানাতেই শুয়ে প'ললেন। ইনা ও তার ভাই তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। ইনার জ্যাঠাম'শায় সন্ধ্যের আগেই দিন দুয়েকের জন্য কোলকাতার বাইরে গেছেন। মহামুস্কিলে প'লাম আমি, বুঝলে সুচারু।

"একটুতেই মাসিমা অধৈর্য্য হ'য়ে পড়েছেন। আমাকে ডেকে

বোললেন, 'মাথা ছিঁড়ে পড়ছে অরুণ, টিপে দেবে একটু মাথাটা?'

"ব'সলুম মাথা টিপ্‌তে। কপালে আমার হাতের স্পর্শ পেয়েই একটু আরামের নিঃশ্বাস ছাড়লেন, 'আঃ, তোমার হাতটা কী ঠাণ্ডা! আঃ!…আলোটা বড্ডো চোখে লাগছে যে অরুণ। নিবিয়ে দাও না আলোটা!'

"আলো নিবিয়ে দেওয়ার আগে একটা জিনিষ লক্ষ্য কোরলুম। অন্য দিনের চাইতে তাঁর সাজসজ্জা যেন একটু বেশি মনে হ'ল। তাঁর পরণে আমারই একটা মিহি-ধুতি দেখে আশ্চর্য্য হ'লাম।

"অন্ধকার ঘরের মধ্যে বসে' তাঁর মাথা টিপ্‌তে কেমন যেন বিশ্রী লাগছিলো। সত্যি সুচারু, উনি যখন আমার আঙুলগুলো মুঠো কোরে চেপে ধরছিলেন, আমার ইচ্ছে হচ্ছিলো ছিনিয়ে নিই হাতখানা। ছিনিয়ে নিয়ে ঘর থেকে পালিয়ে যাই। একটু বাদে যখন হাত টিপে দিতে বোললেন—আমি রীতিমতো ঘাম্‌তে লাগলুম। হাত আর চলে না আমার। ওঃ, সুচারু, তাঁর চোখ-মুখ দিয়ে যেন আগুন ছুটছিলো। কখনো আমার গা'য়ে হাত ছুড়ে ফেলেন, কখনো অধৈর্য্য হ'য়ে চেঁচাচ্ছেন, 'আর সহ্য কোরতে পারছি না অরুণ!…'

"আমার ভয় হ'ল! বুঝতে পারলুম, আর সেখানে থাকা উচিত নয়। আমি খাট থেকে উঠে যাচ্ছি দেখে তিনি নিজেই

উঠে প'লেন,—'তোমার কষ্ট হচ্ছে, আচ্ছা, আমি ও-ঘরে গিয়ে শুচ্ছি।'…"

সুচারু তার বন্ধুর দিকে তাকালো। চোখে তার বোবা দৃষ্টি। অরুণ চুরুটের ছাই ঝেড়ে ভাঙা-গলায় আবার সুরু কোরলো, "তিনি ত চলে' গেলেন তাঁর ঘরে—কিন্তু সেই রাত্রেই নাটকের আর এক অঙ্ক সুরু হ'ল। অর্থাৎ, রাত দু'টোর সময় ইনা এসে আমাকে ডাকলো।"

হঠাৎ সুচারুর দৃষ্টি বিস্ফারিত হ'য়ে উঠলো, "দুঃসাহস ত কম না!"

"কী বোলছো সুচারু, দুঃসাহস! হ্যাঁ, সে-দুঃসাহস ক্রমে দুর্দ্দমনীয় হ'য়ে উঠলো। সেই রাত-দুপুরে এসে ইনা কি বোললে জানো! বোললে, 'তুমি ত মনের আনন্দে আজ মার্কেট, কাল এরোড্রোম, পর্শু অমুক্-তমুক্ দেখে বেড়াচ্ছো—আর দিন-দিন মা-র দু' চোখের বিষ হ'য়ে উঠছি আমি!—' আমি একটু হাসির অভিনয় কোরে বোললুম, 'কেন, কী হ'ল আবার!'

"সে বোললে, 'না, আর আমার সহ্য হয় না! হয় তুমি আমায় এখান থেকে কোথাও নিয়ে চলো, নয় বিষ এনে দাও—খেয়ে আত্মহত্যা করি। আর আমি সহ্য কোরতে পারছি না!'

"এদিক্-ওদিক্ দেখে আমি তার একটা হাত চেপে ধরলুম, 'বলো না, কী হয়েছে—বলো না ইনা?'

"সে বোললে, 'আস্তে, ওগো আস্তে!···আজ দুপুরে তোমার জন্যে একটা সিল্কের রুমালে ফুল তুল্‌ছিলাম। মা জিজ্ঞেস্ কোরলে, কী হ'চ্ছে ওটা? আমি বোললুম,—একটা রুমাল,—অরুদা'র জন্যে। শুনে মা মুখ গোম্‌রা কোরে বোললে,—বাজারে ঢের রুমাল কিন্‌তে পাবে অরুণ,—পড়াশুনো চুলোয় দিয়ে তোমাকে ও নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না।···আর, শুনলাম, আমাকে এখান থেকে সরিয়ে বোর্ডিং-এ রাখবার ব্যবস্থা হচ্ছে!'—আস্তে-আস্তে ইনা তার মাথাটা আমার বুকের মধ্যে গুঁজে দিলো, 'তোমাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারবো না—শিগ্‌গির আমাকে যেখানে হয় নিয়ে চলো!'

"এ স্বধু তার ছেলেমানুষী—এই ভেবে আমি চুপ্ কোরে ছিলাম। কিন্তু, এত সহজে স্থির হওয়ার পাত্র সে নয়। আমার চোখের উপব চোখ রেখে বোললে, 'চুপ্ কোরে রইলে যে! তুমি এত ভীতু? পুরুষ মানুষ হ'য়ে···'

"আমি তা'কে থামিয়ে বোললুম, 'রাগ কোরো না ইনা—বলো কোথায় নিয়ে যাবো!'

"সে তখন মরীয়া হ'য়ে উঠেছে, 'যেখানে হয়,—এই মুহূর্ত্তে আমি এ-বাড়ী ছেড়ে পালাতে পারলে বাঁচি। মা-র দুর্ব্যবহার আর আমার সহ্য হয় না!'

"আমি তা'কে বুঝোতে চেষ্টা কোরলুম, 'বেশ ত, না-হয়

কোথাও গেলাম! কিন্তু সেখানে গিয়ে চলবে কি কোরে—সে-কথাটা কি কখনো ভেবে দেখেছো?'

সুচারুকে সম্বোধন কোরে অরুণ এবার একটু হাসলে, "বড়ো বেশি দুঃসাহস মনে হচ্ছে, না সুচারু! কিন্তু আমার এই কথার উত্তরে সে নির্ভয়ে কী বোললে জানো? বোললে, 'ভাববো আবার কী? তুমি যা' উপায় করো তা'তেই আমাদের কোনো-রকমে চলে' যাবে। আর যাবার সময় হাজার তিনেক টাকার গয়না সঙ্গে কোরে নিয়ে যাবো—বিশ্বাস কোরে মা এখনো সিন্দুকের চাবি আমার কাছে রেখে দেয়।' তারপর সে আমার কাঁধে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বোললে, 'বুঝলে,—তোমার মতো আমি ভীতু নই!'

"আমি হতভম্ব হ'য়ে তার মুখের দিকে তাকালুম, 'না—না, ভীতুর কোনো কথা হচ্ছে না,—তবে, আমাকে একদিন ভেবে দেখবার সময় দাও!'

"এমন সময়, সুচারু, হঠাৎ ইনা আমার বুক থেকে মাথা তুলে নিয়ে তাদের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল, 'দাঁড়াও, আসছি।' কয়েক মিনিট সেখানে দাঁড়িয়ে থাকার পর নানান্ দুশ্চিন্তা নিয়ে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লুম। সে আর এল না।

"দু'-একদিন কাটলো তারপর। এই দু'-একদিনের মধ্যে ইনার একটু ভাবান্তর লক্ষ্য কোরলুম। আর দেখলুম, কে যেন

ওর মুখে এক পোঁচ্ কালি টেনে দিয়েছে! নানান্ কারণে আমার একটু সন্দেহ হ'ল! হয়তো···

"এর পরই একদিন, তেতলার সিঁড়িতে উঠছি, আমার কানে এল, মাসিমা মেয়েকে শাসাচ্ছেন,—'তোর মুখ দেখতেও আমার ঘেন্না হয়—যা' কখনো ভাবিনি আমি, তুই তাই···!' আমার পায়ের শব্দে তিনি চুপ্ কোরলেন।"

সুচারু ভুরু কুঁচ্‌কে জিভ্ দিয়ে একটা শব্দ কোরলো, "ইস্, শেষপর্য্যন্ত ধরা পড়ে' গেলে!"

অরুণ মাথা হেঁট্ কোরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো, "সুধু ধরা পড়ে' গেলুম না, সেদিন বুকের সব ক'টা পাঁজ্‌রা গুঁড়িয়ে গেল।···

"তারপর, তাদের সংসারের হাল্-চাল্ গেল বদ্‌লে। দেখলুম, ঝি-চাকর হঠাৎ মাসিমার মেজাজে সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠেছে। ছেলে-মেয়ে আর তাঁর মুখের দিকে চাইতে সাহস করে না। বিকেলের আড্ডা আর বসে না বোললেই হয়। মাসিমাকেও আর চিন্‌তে পারা যায় না যেন। সংসারের প্রত্যেকটি খুঁটি-নাটিতে গম্ভীরভাবে মন দিয়েছেন তিনি,—আর আমার সাথে বাক্যালাপ নেই বোললেই হয়।

"কী বোলবো সুচারু, তখন ইচ্ছে হচ্ছিলো, হয় আত্মহত্যা করি,—নয় চিরদিনের মতো কোলকাতা ছেড়ে চলে' যাই।"

হল্‌দে দুপুর

হঠাৎ সুচারুর কণ্ঠে নির্ব্বিকার পৌরুষের সুর বেজে উঠলো, "তারপর কি কোরলে?"

"তারপর,—মাসিমা-ই একদিন অত্যন্ত সহজ, সরল ভাষায় বোললেন, 'অরুণ, দোতলাটা পূরোপুরি না সারালে আর চল্‌ছে না। তুমি যে-ঘরটায় থাকো, ওটার ছাদ বদ্‌লে কিছু অদল-বদল কোরতে হবে। আর ফেলে রেখে লাভ নেই—ঠিক কোরেছি, মাস কয়েক আমরা বাবার ওখানে গিয়েই থাকবো। তুমি বরং আপাতত একটা মেসে…'

"আর কিছু বুঝতে বাকি রইলো না সুচারু, পরদিনই একটা মেস্ দেখে নিয়ে চলে' এলুম ওখান থেকে। আশা কোরেছিলুম, আসবার আগে ইনা অন্তত এক মুহূর্ত্তের জন্যও কোনোও রকমে দেখা কোরবে। কিন্তু কোথায় ইনা? সে আর ও-বাড়িতে আছে ব'লেই মনে হ'ল না!

"বাক্স-বিছানা গুছিয়ে নিয়ে ট্যাক্সিতে এসে চেপে ব'সেছি। তখনও কিন্তু দুর্ব্বল মনের কোণে শেষবিন্দু আশা ধুক্-ধুক কোরছে: ইনা আগের মতো নিশ্চয়ই একবার বারান্দায় এসে দাঁড়াবে!

"গাড়ি ষ্টার্ট দিলে তাকালুম বারান্দার দিকে,—ইনা নেই সেখানে। তার বদলে করুণ চোখে গাড়ির দিকে তাকিয়ে আছেন মাসিমা।"

হল্‌দে দুপুর

চা' এল আবার। অরুণ তার বন্ধুর দিকে একটা পেয়ালা এগিয়ে দিয়ে বোললে, "নাও, সুচারু।"

"না, আমি আর চা খাবো না"—সুচারু নিস্পৃহতা দেখালো,—"সকাল থেকে এ-পর্য্যন্ত তোমার ক'কাপ হ'ল?"

"তার কি কোনো হিসেব আছে!—জীবনের চাইতে চায়েই যে এখন বেশি স্বাদ পাই!"—অরুণের মুখে দার্শনিকের হাসি।

"না, এত বেশি চা খেয়ো না—এম্‌নি কোরে আত্মহত্যা কোরো না অরুণ।"

"আত্মহত্যা!" অরুণ আবার হেসে উঠলো, সে-হাসিতে কঠিন, নিষ্ঠুর বিদ্রূপ, "আত্মহত্যা,—আত্মহত্যা ত অনেকদিন আগেই কোরেছি!"

সুচারু একটু চুপ্ থেকে উঠে দাঁড়ালো, "চলি এখন অরুণ, আর একদিন আসবো।"

"না না, আর একটু ব'সো—নাটকের শেষ অঙ্ক না শুনে চলবে কোথায়!"

তারপর চায়ের কাপে গভীর চুমুক্ দিয়ে সে আবার সুরু কোরলো, "সেদিন দু'বছর বাদে ঘুরতে-ঘুরতে ওদের বাড়িতে গিয়েছিলুম। অবিশ্যি, এর আগে প্রতিজ্ঞা কোরেছিলুম, আর কখনো ওখানে যাবো না—কিন্তু সুচারু, ইনার জন্যে—" নিঃশব্দ কান্নার বাষ্পে অরুণের কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে আসছিলো, "যাক্, সেদিন

গিয়ে কী দেখলুম জানো? দেখলুম, তাদের সংসারের শান্তিতে যে চিড়্ ধরে'ছিলো, তা' কোথায় মিলিয়ে গেছে। ওর মা আগের মতোই প্রাণখুলে গল্প কোরলেন আমার সাথে—সবই আবার আগের মতো বিনা বাধায় গড়িয়ে চলছে দেখলুম।

"সেদিন—আশা কোরেছিলুম, হয়তো ইনা একটিবার এসে দেখা কোরবে। কিন্তু কোথায় সে?…

"তারপর নিচে নেমে আসছি, মাসিমা আমার পিছু-পিছু এসে বোললেন, 'মাঝে-মাঝে এসো অরুণ।'…আমি কোনো উত্তর দিলুম না। গোপনে চোখের জল মুছে দেখলুম: আমার ঘরটি ফাঁকা পড়ে' আছে,—আজো তার কিছুই অদল-বদল হয় নি।"